উৎস মানুষ

৩৪ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সর্ষের মধ্যেই ভূত		
সুকুমারী ভট্টাচার্য		২
প্রশ্ন ও প্রগতি	সুকুমারী ভট্টাচার্য	৩
অন্ধ সংস্কার: ভারতীয় সংস্কৃতি	অবনীমোহন ঘোষ	৫
সেই ধন্য নরকুলে	ষড়ানন পণ্ডা	৮
অচেনা পরিশোধিত চিনি	গৌতম মিস্ত্রি	১০
পাঠানি: খালি চোখেই	সমীরকুমার ঘোষ	১৪
আর্দ্রতার সাতকাহন	বিবেক সেন	১৬
সুন্দরবনে মানুষ	অঞ্জন সেনশর্মা	২০
মোসালেম মুন্সি	সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী	২৬
এক 'বিশুদ্ধ' মানুষ	পূরবী ঘোষ	২৭
পুস্তক সমালোচনা	ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	২৮
মাইক ব্যবহার	সাধন বিশ্বাস	৩০
চিঠিপত্র		৩২

সম্পাদক

সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস: বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়: খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস- ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০ ১৩৬

ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/

৯৮৩১৪৬১৪৬৫

ওয়েবসাইট: www.utsamanush.com

ই-মেল: utsamanush1980@gmail.com

সর্ষের মধ্যেই ভূত

সম্প্রতি সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রয়াত হয়েছেন। আর তাঁর প্রয়াণে বড় আক্ষেপ হচ্ছে। হাতের কাছেই এমন একজন মুক্তমনা মানুষ ছিলেন, আর আমরা তাঁকে কেন এতদিন কাজে লাগাইনি। যোগাযোগ হয়েছিল বড্ড দেরিতে। ভেবেছিলাম অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মারক বক্তৃতায় ওঁকে আনার কথা। কিন্তু তখন উনি শয্যাশায়ী। লেখার জন্য বলায় বলেছিলেন, না লিখলেও প্রশ্ন পাঠিয়ে দিলে উত্তর লিখে দেবেন। সেটাও হল না। এই সংখ্যায় ওঁরই একটি লেখা দিয়ে ওঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

এ বছরই প্রায় নিঃশব্দে চলে যাচ্ছে অবনীমোহন ঘোষের জন্মবার্ষিকী। 'তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক' নামে যে বইটি উৎস মানুষ প্রকাশ করেছিল তাতে ওঁর কথাও আছে। ওঁর প্রিয় বিষয় ছিল সাপ। তবে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদেও ছিল সমান আগ্রহ। তাই ওঁরও একটি লেখা পাঠকের দরবারে হাজির করছি।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শেষমেশ খুনই হয়ে যান বিজ্ঞানকর্মী নরেন্দ্র দাভোলকার। পুলিশ এখনও খুনিদের ধরতে পারেনি বা ধরেনি। ইতিমধ্যেই এক মজার খবর জানা গেল, দাভোলকারের হত্যারহস্যের সমাধান করতে মানস ঠাকুর নামে এক প্রাক্তন হাবিলদার ও স্বঘোষিত তান্ত্রিকের সাহায্য নিয়েছিলেন পুনের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার গুলাবরাও পল। গুলাবরাওয়ের ঘরেই নাকি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ চলত। তান্ত্রিকের ঘাড়ে দাভোলকারের আত্মা ভর করেছিল এমনও শোনা গিয়েছে। গুলাববাবু ফাঁকতালে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনিদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করতেন। সেই অনুযায়ী নাকি ধরপাকড়ও করেছেন। তবে শেষমেশ মামলা চলে যায় সি বি আইয়ের হাতে। সি বি আইয়ের নামে আমরা আহ্লাদে আটখানা হলেও, তারা অন্য বহু মামলার মতো এক্ষেত্রেও যে কী অশ্বডিম্ব প্রসব করবে কে জানে!

পরিশেষে আরেকটি আকর্ষণীয় খবর। স্যর গঙ্গারাম হাসপাতালের সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি অ্যান্ড অর্গান ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন বিভাগের চেয়ারম্যান তথা কারেন্ট মেডিসিন রিসার্চ অ্যান্ড প্র্যাকটিশ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ডাঃ সমীরণ নন্দী একটি মারাত্মক বোমা ফাটিয়েছেন ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে। সেখানে তিনি ভারতের চিকিৎসাচিত্রটি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। জানিয়েছেন, এখানকার চিকিৎসকেরা অন্যত্র

রেফার করে তা থেকে দালালি নেন এবং নিজের লাভের জন্য কোনো প্রয়োজন ছাড়াই রোগীর নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। চিকিৎসা-দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে ডাঃ নন্দীর সার কথা হল – রোগীরা এখন ভোক্তায় (কনজিউমার) পরিণত হয়েছে, আর লোকসানটা সবসময়ে হচ্ছে তাদেরই। একজন চিকিৎসক হয়েও এতবড় সত্য কথাটা বলার জন্য ডাঃ নন্দীকে অভিনন্দন জানাই। তবে সত্যি কথা বলার জন্য তাঁকেও দাভোলকারের মতো মাশুল দিতে হবে কি না কে জানে। ভীমরুলের চাকে ঘা দিলে, তারা কি ছেড়ে দেবে! দাভোলকারকে তারা যেমন ছাড়েনি, ছাড়ছে না বরুণ বিশ্বাস, সৌরভ চৌধুরিদেরও।

আল গোরে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে অনেকদিন গলাবাজি করছেন। দারুণ একখানা তথ্যচিত্রও বানিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নাকি গড় মার্কিনির চেয়ে ২০ গুণ বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। প্রসঙ্গত এক ভারতীয় মুখ্যমন্ত্রীর কথা জানাই। তাঁর নাম শীলা দীক্ষিত। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন শীলা থাকতেন মতিলাল নেহরু মার্গের এক বাংলোতে, এখন যেখানে সদ্য-প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং থাকেন। বাংলোয় শোবার ঘর চারটি। শীলা দেবী সেখানে থাকাকালীন তাঁকে উষ্ণ ও শীতল রাখার জন্য মাত্র ৩১টা এয়ারকন্ডিশনার, ১৫টা ডেজার্টকুলার, ১৬টি এয়ার পিউরিফায়ার ও ১৪টা হিটার লাগানো হয়েছিল। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি লাগানোর জন্য খরচ হয়েছিল ১৬.৪১ লাখ টাকা। সম্প্রতি তথ্যের অধিকার আইনে বিষয়টি জানা গিয়েছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের ওপর প্রবল দুর্বলতা। একটু নাক দিয়ে জল পড়ল কি পড়ল না, নিজেরাই ঠিক করে নিই অ্যান্টিবায়োটিক চার্জ করতে হবে। সর্দি-কাশি ভাইরাস ঘটিত রোগ। কে কাকে বোঝায়! গরম জলের ভাপে ভরসা নেই। বিশেষজ্ঞরা বারবার বলছেন এটা মোটেই ভাল জিনিস নয়, একবার শরীর অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী হয়ে উঠলে সুস্থতা দূরে থাক, প্রাণ যেতে পারে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা 'গ্লোবাল ট্রেন্ডস ইন অ্যান্টিবায়োটিক কনজামশন ২০০০-২০১০' নামে যে সমীক্ষা ফলাফল প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, গত এক দশকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ায় ভারত অন্য সব দেশকে টেক্কা দিয়েছে। ব্যবহার বেড়েছে ৬২ শতাংশ। এরপর আর কেউ বলতে পারবে না, আমরা সব তাতেই অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছি।

সুকুমারী ভট্টাচার্য

(১৯২১-২০১৪)

কী বলবেন, মহিলা কালাপাহাড়! হিন্দুধর্মের মাতব্বররা বরাবর বেদ-উপনিষদের যুগে মহিলাদের কী উচ্চ ও শ্রদ্ধেয় স্থান ছিল, তা নিয়ে গলা ফাটান। অনন্ত সদাশিব আলটেকারের মতো জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরাও বলেছেন, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি অভিযানের আগে পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে নারীর মর্যাদা ছিল অতি উচ্চে। মধ্যযুগ থেকেই নাকি নারীর অবনমনের সূচনা। সুকুমারী এই তত্ত্বের মূলেই কুঠারাঘাত করেন। প্রতিষ্ঠা করে দেন, ঋক্‌বেদ পরবর্তী আমল থেকেই পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক ও পারিবারিক সংগঠনের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর মর্যাদা পুরুষের তুলনায় গৌণ। বৈদিক সাহিত্য, ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ এবং সৃজনশীল সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য থেকে ভূরি ভূরি উদাহরণ পেশ করে প্রমাণ করে দেন, খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকেই নারীর মর্যাদা ক্রমশ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুকুমারীর জন্ম জুলাই মাসেই। ১৯২১-এর ১২ তারিখে। মজা করে বলতেন, 'জুলিয়াস সিজারের জন্মদিনই আমার জন্মদিন।' মাইকেল মধুসূদন দত্তের উত্তরসূরি ছিলেন সরসীকুমার দত্ত। সরসী ও শান্তবালা দত্তের প্রথম সন্তান সুকুমারী। তাঁর আরও তিন ভাইবোন ছিল। সুকুমারী ছোট থেকেই প্রতিবাদী এবং নিখাদ স্বদেশপ্রেমী। সে কারণেই সেন্ট মার্গরেট স্কুল যখন 'গার্ল গাইড' হওয়ার প্রস্তাব দেয়, তখন দৃঢ়তার সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করেন। জানিয়ে দেন, গার্ল গাইডকে ঈশ্বর, রাজা ও দেশের নামে শপথ নিতে হয়। যারা তাঁর স্বর্গাদপী গরিয়সী জন্মভূমিকে পরাধীন করে রেখেছে, তাদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারবেন না।

আপাদমস্তক নিরীশ্বরবাদী হলেও জন্মসূত্রে সুকুমারী ছিলেন খ্রিষ্টান। শোনা যায়, পিতামহ বিপিনবিহারী হিন্দু সমাজের অযৌক্তিক কঠোর আচার-বিচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কলকাতায় এসে ধর্মান্তরিত হন। এর জন্য সুকুমারীকে বিস্তর গুনাগার দিতে হয়েছে। বাঙালি হলেও খ্রিষ্টান পরিবারের মেয়ে, সে কেন সংস্কৃত পড়বে। এই যুক্তিতেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সংস্কৃতে এমএ পরীক্ষা দিতে দেয়নি। সংস্কৃত পণ্ডিতরা তাঁকে দেবভাষা পড়াতে রাজি হন না। যেন সংস্কৃতের সঙ্গে তথাকথিত হিন্দুস্তান বা ভারতবর্ষের বহমান জীবনের যোগ নেই, এ কেবল আদি হিন্দুদের ভাষা। অগত্যা শেষ মুহূর্তে বিষয় বদলে তিনি ইংরেজিতে এমএ পরীক্ষা দেন। ভালভাবেই পাস করে যান। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে মেয়েদের প্রবেশ অধিকার ছিল না বলে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। স্নাতক স্তরে সমস্ত বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েও 'ঈশান স্কলারশিপ' পাননি, কারণ সেটা হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ধার্য ছিল। সংস্কৃতকে ছাড়েনি সুকুমারী। প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে এমএ পাস করেন। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে তাঁকে সেই সময় খুব সাহায্য করেছিলেন। উল্লেখ্য, সুকুমারীর মতো মুসলমান বলে মুহম্মদ

শহিদুল্লাহকেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াতে রাজি হননি সত্যব্রত সামশ্রমী। গুরু হিসাবে সুকুমারী আর একজন মুক্তমতি মানুষকে পেয়েছিলেন। তিনি হলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রিয় ছাত্রীটিকে শিখিয়েছিলেন অধ্যয়নের গূঢ় মন্ত্র— এক্সেলসিয়র, ক্রমাগত উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে চলো। সুকুমারী এই মন্ত্র জপতে জপতে এগিয়েছেন, শিখিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদেরও। বুদ্ধদেব বসুর ডাকে যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যোগ দেন। এক বছর পরে অধ্যাপক সুশীলকুমার দে তাঁকে সংস্কৃত বিভাগে নিয়ে যান। তবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও যে তাঁর সঙ্গে সুবিচার করেছে এমন নয়। তাঁকে প্রফেসরশিপ দেওয়া হয়েছিল অবসর নেওয়ার কয়েক বছর আগে। বিয়ে করেছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্যকে। খ্রিষ্টান মেয়ে, ছেলে হিন্দু ব্রাহ্মণ— এ নিয়েও জলঘোলা কম হয়নি। পরিবারেই নানাজনে আপত্তি তোলে। সুকুমারীর পাশে দাঁড়ান দিদিমা। যুক্তি দেখান মেয়েদের যখন পছন্দমতো শাড়ি-গয়না বাছার অধিকার আছে, অধিকার আছে জীবনসাথী বেছে নেওয়ারও। এই রকম পারিপার্শ্বিক নানা মানুষের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল সুকুমারীর মুক্ত ভাবনাচিন্তার ক্ষমতা। বরাবর বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বলে বামপন্থীরা তাঁকে খুব আমল দিয়েছিল, ভাবলে ভুল হবে। জ্ঞানতপস্বী সুকুমারী অবশ্য তার তোয়াক্কাও করতেন না। স্বামী অমলবাবু বরাবর পাশে থেকে এগিয়ে যাওয়ায় সাহায্য করেছেন।

ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে তাঁর বই ৩৪টি। কেম্ব্রিজ থেকে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান থিয়োগনি' গোটা বিশ্বেই সমাদৃত। প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য, বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, নিয়তিবাদের উদ্ভব ও বিকাশ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, বিবাহপ্রসঙ্গে প্রভৃতি বই তাঁর মৌলিক বিশ্লেষণী মননের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

স্বামী প্রয়াত হয়েছিলেন আগেই। মেয়ে-জামাই তনিকা ও সুমিত সরকার থাকেন দিল্লিতে। কলকাতায় একাই থাকতেন। আশি-নব্বইয়ের কোঠায় পৌঁছনোর পর শরীর ক্রমশ অশক্ত হয়ে পড়ছিল। কিন্তু জানার খিদে এতটুকু কমেনি। নিজে পড়াশোনা করতেন, সেই সঙ্গে খোঁজখবর রাখতেন অনুজরা কে কী পড়ছে, ভাবছে। ছাত্রছাত্রীরা তর্ক করলে খুব খুশি হতেন।

মানবধর্মে বিশ্বাস করতেন। তাই মরণোত্তর দেহ দান করে গিয়েছিলেন। গত ২৪ মে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তা দান করা হয়।

আ•হ•র•ণ

প্রশ্ন ও প্রগতি

সুকুমারী ভট্টাচার্য

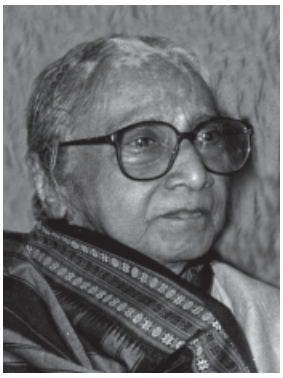

এই প্রত্যয় সন্দেহের ভিত্তি বলেই সন্দেহ পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির কারণ। আপেল মাটিতে পড়ে কেন, এ প্রশ্ন নিউটনকে যদি বিচলিত না করত তা হলে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কৃতই হত না; জ্ঞানের জগতে অগ্রগতি প্রতিহত হত, ওই সূত্রে গ্রথিত আরও অনেক আবিষ্কারই হতে পারত না। তেমনই, কে দেখেছে ইন্দ্রকে জন্মাতে? এ প্রশ্ন মানুষকে ভাবিয়েছে যে, যেহেতু সব মানুষই একদিন জন্মায় এবং অধিকাংশ দেবতাই যাস্কের মতে মনুষ্যাকৃতি, তাই ইন্দ্রেরও নিশ্চয়ই একদিন জন্ম হয়েছিল, কিন্তু কেউ তো তা দেখেনি। অতএব ইন্দ্রের জন্ম ব্যাপারটাই সংশয়াচ্ছন্ন এবং তার ফলে ইন্দ্রের অস্তিত্বও সংশয়াতীত নয়। নেম ভার্গব বলে: ইন্দ্র নেই। এই উক্তি খণ্ডন করতে একটি সূক্ত জুড়ে ধ্রুবপদ সৃষ্টি করতে হল, 'স জনাস ইন্দ্রঃ'। কিন্তু জনমানসে প্রশ্ন এবং নেম ভার্গবের ইন্দ্রকে অস্বীকার করা ঘোষণাটি রয়ে গেল। পুরোনো বহু দেবতা, ভগ, পর্জন্য, ইলা, ভারতী, মার্তণ্ড, অর্যমা, দক্ষ, অংশ— এরা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল, নতুন অনেক দেবতা স্থান পেল দেবমণ্ডলীতে, দেবমণ্ডলীর বিবর্তন ঘটল, তা আর স্থাণু রইল না। তেমনই পূর্বতন বহু যজ্ঞে ফল হচ্ছিল না দেখে মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করেছে, সরে এসেছে, কখনও বা কোনও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছে কারণ সমাজের মূল ধর্মধারা তাদের চিহ্নিত করেছে নাস্তিক, বেদবিরোধী বলে। এই বিরোধ প্রকাশিত হয়েছে সন্দেহের রূপে, কখনও-বা আরও গভীর, ব্যাপক বা মৌলিক হলে, নাস্তিক্যের রূপে। এর ফলে চিন্তাশীল মানুষ নতুন করে চিন্তা করেছে, কখনও উত্তর পেয়েছে, তখন সমাজে জ্ঞানের জগতের পরিসর বেড়েছে। রাহুকেতুর গ্রাসে সূর্য-চন্দ্র-গ্রহণ মানুষ ততদিনই বিশ্বাস করেছে যতদিন তার চেয়ে সংগততর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেলেই জ্ঞান বেড়েছে, মানুষ পুরাতন কুসংস্কার ত্যাগ করে কার্যকারণ-পরম্পরার সন্ধান পেয়ে জ্ঞানের জগতের দিক্‌চক্রবালকে প্রসারিত করেছে।

দেখা যাচ্ছে, জ্ঞানের বৃদ্ধির জন্যে, ঐতিহ্যবাহিত কুসংস্কারের পরিবর্তে

কার্যকারণ-সংবলিত যথার্থ তথ্য জানবার জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজনই হল সন্দেহ, অস্বীকার করা, প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করা, শাস্ত্র-পুরোহিতের দেওয়া ব্যাখ্যাকে পরিহার করা, তাকে ভুল, অযথার্থ বলে ঘোষণা করা। এর পরে যদি কেউ সংগততর, বেশি যুক্তিপূর্ণ কার্যকারণ-পরম্পরায় গ্রথিত কোনও সমাধান পেশ করেন যা সমাজপতিরা তাদের স্বার্থহানি না হলে স্বীকার করে; আর তাদের স্বার্থহানি হলে সরাসরি নাস্তিক, পাষণ্ড, পাপী বলে ব্যাখ্যাত ও প্রশ্নকর্তা দু'জনকেই শাপশাপান্ত করে। কিন্তু যখন সমাধান পাওয়া যায়, তখন সমাজ জ্ঞানের জগতে এক ধাপ এগিয়ে যায়। এটা সম্ভবই হত না যদি না প্রাথমিক স্তরে প্রশ্ন, সন্দেহ বা নাস্তিক্য ঘোষিত হত। যজ্ঞ ও বেদ সম্বন্ধে সংশয় ঘোষিত হতে হতে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ও আরও বহু বেদবিরোধী প্রস্থান রচিত হয়েছে, ফলে জীবনজিজ্ঞাসা গভীরতর হয়েছে, দর্শন ও নীতি সমৃদ্ধ হয়েছে। যজ্ঞকে অস্বীকার করে জন্ম নিয়েছে জন্মান্তরবাদ, মোক্ষ ও নির্বাণের কল্পনা, এতে সমাজের অগ্রগতি নিশ্চয়ই হয়নি বরং ক্ষতিই হয়েছে; কিন্তু পরম্পরাক্রমে লব্ধ বিশ্বাসের ছকটিকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার এই চেষ্টার (justifying the ways of God to men) মধ্যে নতুন করে চিন্তা করতে হয়েছে মানুষকে, এবং বানপ্রস্থ ও যতি দুটি আশ্রমকে আশ্রমবর্গের অন্তর্গত করতে হয়েছে, এতে কিছুকালের জন্য অন্তত সামাজিক সংহতি রক্ষিত হয়েছে।

যাস্কের বহু ব্যুৎপত্তি ভুল। কিন্তু শব্দমাত্রেরই যে বুৎপত্তি আছে এই বিশ্বাসই ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের সৃষ্টির মূলে এবং এরই বিশ্বাস এসেছে প্রশ্ন ও সন্দেহের মধ্যে দিয়ে, 'তৎ কাবশ্বিনৌ?' 'তা হলে অশ্বিন্‌রা কারা?' উত্তরে যা বলা হল, তার সব-কটি বিকল্পই ব্যুৎপত্তি হিসেবে অগ্রাহ্য। কিন্তু দেবতাদের একটি বাস্তব পটভূমিকা আছে, এ বিশ্বাসের ওপরেই সব-কটি বিকল্প প্রতিষ্ঠিত, এবং এ উত্তর মিলত না যদি মূলে প্রশ্নটি না থাকত। সমস্ত বেদাঙ্গের সৃষ্টি ওই প্রশ্ন থেকে। (অথর্ববেদে যত উদ্ভিজ্জ ও খনিজ দিয়ে রোগ সারার কথা আছে তার সবই বিজ্ঞানসিদ্ধ নয়, কিন্তু অভিজ্ঞতায় পাওয়া কিছু জ্ঞানের সঙ্গে প্রশ্ন ও সন্দেহ থেকে উৎপন্ন অনুসন্ধিৎসা ওই সব আবিষ্কারের মূলে।) রোগই একটা প্রশ্ন, স্বাস্থ্য স্বাভাবিক, তার থেকে বিচ্যুতিই রোগ; তা কেন হবে এই প্রশ্নই ভেষজশাস্ত্র আবিষ্কারের মূলে। পৃথিবীতে এখনও অনেক জাতি আছে যারা মোটামুটি এক ধরনের চলনসই জীবনযাত্রার উপায় নির্ধারণ করে সেই অনুসারে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, তার বাইরে তাদের উন্নতি হয়নি, কারণ তার বাইরে তারা প্রশ্নই করেনি।

যে-জাত যত বেশি তীব্র, দুরূহ, গভীর ও ব্যাপক প্রশ্ন করেছে, নিতান্ত হতদরিদ্র না হলে সে-জাত প্রশ্নোত্তরের কার্যকারণ পরম্পরা অবলম্বন করে তত বেশি এগোতে পেরেছে। আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ সুখের বদ্ধ জলাশয়ে বাস করা যায়। অনেকে তা করেওছে। কিন্তু অন্য বিকল্পটি মানুষের মনুষ্যত্বের মর্যাদার পক্ষে বেশি গৌরবজনক।

পরিশেষে, মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় আর্যদের প্রথমতম রচনা ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায় থেকেই এত সংশয়। একটি সজীব জনগোষ্ঠীই পারে, পদে পদে সংশয় বোধ করতে। এ কথা অনায়াসেই ধরে নেওয়া যায় যে, তদানীন্তন মানুষের মনে যত সন্দেহ এসেছিল তার সবই রক্ষিত হয়নি। হয়তো বহু প্রশ্ন সমাজপতিদের কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিজনক ছিল বলে সেগুলিকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছিল, যে-কারণে চার্বাকের মতবাদ পূর্ণাঙ্গ ভাবে রক্ষিত হয়নি। চার্বাকের প্রভাব যে জনমানসে খুবই বিস্তৃত ছিল তার প্রমাণ, এ মতকে খণ্ডন না করে কোনও দর্শনপ্রস্থান-রচয়িতাই জলগ্রহণ করেননি। তা-ও চার্বাকমতের যেটুকু রক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে শাস্ত্রসুলভ সংহতি নেই, শুধু সেইটুকুই চার্বাকের কৃতি হলে চার্বাকের জনপ্রিয়তা এত বাড়ত না এবং চিন্তাশীল মানুষ তাঁর অনুগামী হতেন না। তেমন মানুষ যে চার্বাকপন্থী হয়েছিলেন তার প্রমাণ হল, এ মতের খণ্ডনে এত গরজ, ঔৎসুক্য ও চিন্তাশ্রম। শুধু নির্বোধরা চার্বাকপন্থী হলে শাস্ত্রকাররা এত ভয় পেত না। বহু বুদ্ধিমান মানুষ তাঁর মতের অনুসরণ করেছিলেন বলেই তাঁর সম্বন্ধে এত আতঙ্ক। এবং চার্বাকের মত ধর্মের মূল ধরে টান দিয়েছিল, আত্মা পরলোক ঈশ্বর অস্বীকার করে। নাস্তিক্য সন্দেহের চূড়ান্ত অবস্থান। আনুষঙ্গিক বহু সন্দেহ ধীরে ধীরে এসে ঠেকে নাস্তিক্যে। নেম ভার্গবের 'ইন্দ্র নেই' বলা সেখানে নাস্তিক্য। নচিকেতা যখন বলে, 'কেউ কেউ বলে মৃত্যুর পরে কিছুই থাকে না' তখন সে সমাজে সঞ্চারমান নাস্তিক্যকেই প্রকাশ করে।

অত প্রাচীনকালে অত মৌলিক সংশয় ও নাস্তিক্য যে-জাতির মধ্যে উদ্‌গত হতে পেরেছিল, সে-জাতি নিঃসংশয়ে একটি অত্যন্ত সজীব, নিয়ত মননশীল জাতি, যারা প্রশ্ন-সমস্যাসঙ্কুল চিন্তাজগতে আপস করতে অস্বীকার করেছিল। প্রচলিত মত ও পথে তাদের চিত্ত তৃপ্তি পায়নি, তাদের চাই ভূমা, কারণ তাদের 'নাল্পে সুখমস্তি'। ঐতিহ্যধারায় প্রাপ্ত বিশ্বাস, শাস্ত্র ও আপ্তবাক্যকে আজ থেকে সওয়া তিন হাজার বছর আগে যে-ভারতীয়রা সন্দেহ করে জীবন সম্বন্ধে নানা মাত্রার, নানা যন্ত্রণাদীর্ণ জিজ্ঞাসাকে এত তীব্র ভাবে উচ্চারণ করতে পেরেছেন, তাঁরা অবশ্যই নমস্য; কারণ তাঁরাই যুক্তিতর্কের সূত্রে নবতর সত্যের পথে এ জাতিকে রওনা করে দিতে পেরেছেন। তাঁদের সংশয় ও নাস্তিক্য আমাদের গর্বের বস্তু— এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার। তাই নিয়েই এই লেখা।

সৌজন্য: গাঙচিল প্রকাশিত সুকুমারী ভট্টাচার্য প্রবন্ধ সংগ্রহ, ২য় খণ্ড।

আ•হ•র•ণ

অন্ধ সংস্কার: ভারতীয় সংস্কৃতি

অবনীভূষণ ঘোষ

মানুষের যে বিচারভিত্তিক বুদ্ধি, তার মূল সূত্র হল কার্যকারণ সম্বন্ধ। কার্য থাকলে তার কারণ থাকবে, আবার কারণ থাকলে তার কার্য ঘটবে। এই কার্যকারণ সম্বন্ধ আমাদের কাছে আজ যতই স্পষ্ট হ'ক না কেন, মানব-ইতিহাসের গোড়ার দিকে আদিম মানুষের এই নিয়মের কোনো ধারণা ছিল না। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তার চোখের সামনে ঘটত। কিন্তু ঐ ঘটনাগুলির মধ্যে যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, তা তার মনে উঠত না। বস্তুত আদিম মানুষ কোনো প্রাকৃত লৌকিক ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত অলৌকিক ব্যাখ্যা দিত। আদিযুগের কথা কেন— আজও, হাজার হাজার বছর পরেও, অনেক সভ্যতা-গর্বিত মানুষের চিন্তাধারা আদিম মানুষের চিন্তাধারা থেকে বিশেষ পৃথক দেখা যায় না। আদিম মানুষের চিন্তাধারারই খাতে তাদের চিন্তাধারা ছোটে।

তার ওপর আছে সংস্কার। পূর্ব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আমরা মনে বহন করে বেড়াই সংস্কাররূপে। মানুষের জ্ঞানের সীমা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। সুতরাং অতীতের এই সব পূর্ব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার অনেকগুলিই বর্তমানে মিথ্যা হয়ে যায়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই সহজ সত্য কথাটা মেনে নিয়ে কাজে পরিণত করা অনেকেরই পক্ষে প্রায় সাধ্যাতীত। আমাদের জীবনধারায় যুক্তিহীন সংস্কার— অন্ধ সংস্কার এমনই ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে! আর যে সংস্কার যত প্রাচীন, তার শিকড় আমাদের জীবনে তত গেড়ে বসে। অথচ মজার ব্যাপার এই, প্রাচীন সংস্কারের মিথ্যায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। তখন তো মানুষের জ্ঞানের রাজ্য খুব ছোট ছিল, বিচারভিত্তিক বুদ্ধিও তেমন পরিপক্ক হয় নি।

এই সব অন্ধ সংস্কার আমাদের চিন্তাধারাকে কলুষিত করে। এমন লোক খুবই কম দেখা যায়, যিনি সকল প্রকার ভ্রান্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিন্তা করেন— যদিও অনেক সময় আমরা নিজেকে এবং অপরকে মন ঠারি যে এই সব ব্যক্তিগত সংস্কার বা বিশ্বাস আমাদের বিচারভিত্তিক চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে না।

ঐতিহ্য বলে একটি কথা আছে। জাতির ঐতিহ্য, পারিবারিক ঐতিহ্য ইত্যাদি। সামাজিক মানুষ তার ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করবে, এ তো স্বাভাবিক। মননশীল মানুষেরই ঐতিহ্য থাকে, জন্তু-জানোয়ারের ঐতিহ্য থাকে না, বন্য মানুষেরও ঐতিহ্য ছিল না। যে জাতির ঐতিহ্য যত সমৃদ্ধ, সে জাতি তত আত্ম-সচেতন। অতীতের এই ঐতিহ্য জাতিকে বর্তমানে যেমন উদ্দীপনা দেয়, ভবিষ্যতের পথ-নির্দেশে তেমনি সাহায্য করে। কিন্তু মুশকিল এই যে, এই ঐতিহ্যের আড়ালেই লুকিয়ে থাকে আমাদের সব অন্ধ সংস্কার। ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে থাকে বলে ভ্রান্ত সংস্কারকে চিনে নেওয়া– চিনে নেওয়ার পরও তাকে মন থেকে দূর করা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশের সংস্কৃতি-গর্বিত মানুষের কথাই ধরা যাক। আমরা আমাদের দেশের ঐতিহ্য নিয়ে বেশ গর্বিত। গর্ব করাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশ খুব প্রাচীন। তার ঐতিহ্যও খুব সমৃদ্ধ। তবে একটা কথা। আমাদের দেশের সংস্কৃতির মূল কথা— মানুষের নিগূঢ় মহত্ত্বের প্রতি আত্যন্তিক বিশ্বাস। এই বৈশিষ্ট্যেই সর্বকালের সর্বজনের প্রতি ভারতীয় সংস্কৃতির চির আবেদন। সাধারণ স্বার্থচেষ্ট মানুষের জীবনে এ তত্ত্বটি কিন্তু থাকে অপ্রকট রহস্যময়। সে একথা বোঝে না। না বুঝলে কী হবে, তার মন তো ফাঁকা থাকতে পারে না! ভারতীয় সংস্কৃতির চলনসই একটা ধারণা সে ক'রে নিয়েছে। যা' ছিল নিজ ঐশ্বর্যে মহীয়ান্ মানুষের আত্মপ্রকাশ, তা দাঁড়িয়েছে পরলোকসর্বস্ব ক্লীব মানুষের ব্যাকুলতায়। যা' কিছু রহস্যময়, যা' কিছু বুদ্ধিবিভ্রান্তিকর, যা' কিছু উৎকট, তাই ভারতীয় সংস্কৃতি। কোটি কোটি মানুষের মনে ভারতীয় সংস্কৃতির এই ধারণাই গ্রথিত হয়ে আছে।

নিষ্ঠাবান্ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ত। একবার তথাকথিত এক অলৌকিক ঘটনার কথা উঠলে আমি তাঁকে বললাম, এসব বুজরুকিতে আপনি বিশ্বাস করেন কী ক'রে? উত্তরে একটু চিন্তাভরেই তিনি বললেন, দেখুন এসব ঘটনায় আমাদের মন যে ঠিক সায় দেয়, তা নয়; তবে আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করি, সুতরাং এসব ঘটনায়ও বিশ্বাস করি। তাঁর কথায় এ ধারণাই করলাম, ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র এমনই একটি রহস্যময় খুঁটির ওপর স্থাপিত যাতে সামান্য বুদ্ধির হাওয়া লাগলে ভেঙে পড়বে! মাত্র এই ভদ্রলোকের কথাই

বলি কেন, আরও অনেক শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতির এই ধারণাই পেয়েছি।

ফলে হয়েছে কি, যে সংস্কৃতি, যে ঐতিহ্য জাতিকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়, তা' আমাদের জীবনধারাকে প্রতি পদে পদে করছে পর্যুদস্ত! অন্ধ সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনে আমাদের জাতীয় জীবন হয়েছে অনড় অচল। যখন সমস্ত মানবজাতি সামনের দিকে চোখ মেলে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলেছে, তখন আমরা পেছন ফিরে চোখ মুদে অতীতের জাবর কাটছি! আর ভাবছি, যা' কিছু উন্নতি, যা' কিছু ভাল— সব অতীতেই হয়ে গেছে, সুতরাং আমাদের আর কিছু করার নেই! জাতির জীবনে কোনো অধ্যায় হয়তো কোনো বিষয়ের সমৃদ্ধিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু সেটাই সব কথা নয়। ভারত-ইতিহাসেরও এইরূপ কোনো কোনো মহিমমণ্ডিত অধ্যায় আছে। কিন্তু সেখানে ছেদ ঘটবে কেন? আজ জ্ঞানে-বিজ্ঞানে মানুষ কত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমাদের জাতিও সমগ্রভাবে এগিয়ে যাবে, এটাই হবে আমাদের কাম্য। কিন্তু তা' সম্ভব নয় যতক্ষণ না ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ— মূল তত্ত্বটি জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অপব্যাখ্যায় অন্ধ সংস্কারগুলিকে দূর করা তো অন্য কথা, সেগুলিকে আরও আঁকড়ে ধ'রে গর্ব অনুভব করি।

অতীত সম্বন্ধে আমাদের যে সাধারণ দুর্বলতা আছে, এখানে তা' স্মরণীয়। শৈশবকাল আমাদের খুব সুখের মনে হয়। দুঃখের কথা আমরা ভুলে যাই, সুখের কথা মাত্র মনে থাকে। অতীত সম্বন্ধেও তেমন আমাদের মধুর গৌরবান্বিত ধারণা হয়। আসলে একথা সব সময়ে সত্য হয় না।

অতীতের ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু আজকের জ্ঞানীরাও যে তাঁদের তুল্য অথবা তাঁদের চেয়েও জ্ঞানী হতে পারেন, তা' আমরা ভাবতে পারি না।

মানুষের রহস্যপ্রিয়তা

বিচারভিত্তিক বুদ্ধির পথে আর একটি বাধা মানুষের রহস্যপ্রিয়তা। যে মানুষ যতই বিচারশীল হ'ক না কেন, তারও মনে যেন রহস্যপ্রিয়তা লুকিয়ে থাকে। রহস্যময় ঘটনা বলতে বা শুনতে সেও যেন একটু আমোদ বোধ করে। সাধারণ লোক তো করেই! অপ্রত্যক্ষের একটু ছোঁয়াচ একটু ভয়-ভয়— বেশ আনন্দ লাগে। খোশগল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে এই রহস্যময় গল্প। রূঢ় বিচারনিষ্ঠ সত্যের পথ থেকে কিছুক্ষণ অবসর নিতেই বোধ হয় মানুষ রহস্যের আশ্রয় নেয়। এই পূর্বপ্রস্তুতি আছে ব'লেই বিশ্বাস না ক'রেও সে সাগ্রহে অলৌকিক গল্প শুনতে ভালবাসে। কিন্তু এই রহস্যপ্রিয়তার বাড়াবাড়ি ঘটলেই প্রমাদ। রহস্যের জালে চিন্তাধারা যায় জড়িয়ে।

কোনো অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে একটু-আধটু আমরা অতিরঞ্জন ক'রে বসি। এই অতিরঞ্জন করি আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই। মানুষের সুপ্ত রহস্যপ্রিয়তাই তার কারণ। বক্তা চায় আমার মত শ্রোতাও বিস্মিত হ'ক। অবশ্য ঘটনাটি যখন একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে, তার মুখ থেকে আর একজনের মুখে যায়, তখন এই সামান্য অতিরঞ্জনই বেড়ে গিয়ে ঘটনার রূপ বহুলাংশে বদলে দেয়। অলৌকিক ঘটনা মূল শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে পাকাপোক্ত হয়ে বসে। যেসব অলৌকিক ঘটনা সাধারণত আমাদের কানে আসে— যাকে কেন্দ্র করে ঘটনাটি ঘটেছে, তার মুখ থেকে সে ঘটনার বিবরণ কদাচিৎ আমরা শুনতে পাই। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মুখ থেকেই সচরাচর শুনি। সুতরাং কোনো অলৌকিক ঘটনা অতিরঞ্জিত আকারেই আমরা জানতে পারি।

যারা মিথ্যাচারী তাদের কথা ধরি না। মিথ্যা একভাবে না আর একভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু যাঁরা সৎ, তাঁরা যখন অলৌকিক ঘটনার কথা বলেন তখনই দাঁড়ায় সমস্যা। তখনই তার লৌকিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন ঘটে।

অতিরঞ্জনের কথা বাদ দিলাম। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকেও কোনো ঘটনার বিবরণ শুনলে তাও সব সময়ে সঠিক হয় না। প্রত্যক্ষদর্শী সচরাচর তাঁর বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ঘটনার বিবরণ দেন। ঘটনার প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ অংশই তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় অংশ ব'লে মনে হতে পারে। আর তিনি সে অংশ বাদ দিয়ে ঘটনার বিবরণ দিতে পারেন। এতে ঘটনার রং সম্পূর্ণ অন্যরকম হতে পারে।

কেউ হয়তো কোনো অলৌকিক ঘটনার কথা শুনালেন। প্রশ্ন করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর দেবেন— না, ঘটনাটা আমার জীবনে ঘটে নি বটে, তবে যাঁর মুখ থেকে শুনেছি তাঁকে অবিশ্বাস করতে পারি না। কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাস তো আসল কথা নয়। ঘটনাটিকে যেভাবে আমরা জানতে পারছি, ঠিক সেভাবেই ঘটেছিল কিনা, এটাই জিজ্ঞাস্য। যারা মিথ্যাচারী তাদের কথা ধরি না। মিথ্যা একভাবে না আর একভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু যাঁরা সৎ, তাঁরা যখন অলৌকিক ঘটনার কথা বলেন তখনই দাঁড়ায় সমস্যা। তখনই তার লৌকিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন ঘটে। অনেক অলৌকিক ঘটনা আমরা বাপ-পিতামহ ঠাকুরমা-দিদিমার মুখ থেকে শুনে থাকি। এসব ঘটনার লৌকিক ব্যাখ্যা কেউ ক'রে দেখালে তার যুক্তিতে আমরা যত না বিরক্ত হই, আসলে আহত হই এই ভেবে যে, বাপ-পিতামহ ঠাকুরমা-দিদিমা যেসব ঘটনা অলৌকিক ব'লে গেছেন তাদের লৌকিক ব্যাখ্যা কি করে সম্ভব! তাঁরা কি এত বোকা ছিলেন? হয়তো তাঁরা বোকা ছিলেন না। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে বোকা আমরা সকলেই। অতি বড় বিজ্ঞানীও ভুল ক'রে থাকেন।

অনেক সময় একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। কেউ হয়তো কোনো অলৌকিক ঘটনার গল্প করছেন। যখন তিনি গল্প করছেন, তার বলার ভঙ্গীতে বেশ বোঝা যাচ্ছে, ঘটনাটির অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে তখনও তিনি নিজেও নিশ্চিত নন। কিন্তু যুক্তি দেখিয়ে যেই প্রতিবাদ করা হ'ল, অমনি তিনি রুখে উঠলেন— এবং ঘটনাটির অলৌকিকত্বের পক্ষে তাঁর মুখ থেকে যুক্তির ফোয়ারা বেরোতে লাগল! যে ঘটনার অলৌকিকত্বে এক মুহূর্ত আগেও তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না, প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে এত যুক্তি জেগে উঠল কেমন করে? আসলে মনে যুক্তি আসে নি— আত্মগরিমায় লেগেছে আঘাত। আমি যে ঘটনা অলৌকিক বলছি, তা' মিথ্যা ব'লে এত সহজেই উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা! অনুরূপক্ষেত্রেই আবার সোজাসুজি প্রতিবাদ না ক'রে একটু ঘুরিয়ে যুক্তি দেখাতে বক্তাকে বলতে শুনেছি, আপনার কথা সঠিক; অতটা খেয়াল করি নি।

যাঁরা নিজেদের জীবনের অলৌকিক ঘটনার কথা বলেন, সেসব ঘটনার অধিকাংশই শৈশবের— যখন আমাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নি, কোনো ঘটনার সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মনোভাব জন্মায় নি, বাহ্যত ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে সেভাবেই গ্রহণ করেছি, যেভাবে লোকে বুঝিয়েছে সেভাবেই বুঝেছি। শ্রদ্ধেয় কোনো ব্যক্তি বলেছেন, সুতরাং গল্পটা শোনার আগেই ধ্রুব সত্য ব'লে ধ'রে নিয়েছি। গল্পটির কাঠামো আজ মনে আছে, কিন্তু ঘটনাটির খুঁটিনাটি বিষয় একরকম ভুলে গেছি। ঘটনাটি অলৌকিক ব'লে মনে হয়েছিল, মাত্র সেটুকুই জাগরূক আছে। পরবর্তী জীবনে ঘটনাটির বর্ণনা দেওয়ার সময় অলৌকিকত্বকেই প্রাধান্য দিয়ে ঘটনাটা সাজিয়ে বলি। সেজন্যে প্রায় দেখা যায়, মূল ঘটনার সঙ্গে বিবরণের খুব অল্পই মিল থাকে।

ফাদার টমাস কোচারি

১০ মে ১৯৪০- ৩ মে ২০১৪

গত মে মাসে প্রয়াত হয়েছেন ফাদার টমাস কোচারি। আর পাঁচজন যাজকের থেকে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র। শুধু যিশুর বাণী শোনানো বা মানবসেবা নয়, দরিদ্র-নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে সরাসরি গড়ে তুলেছেন আন্দোলন। পুরোভাগে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বলতে গেলে, জীবনের সিংহভাগ সময়ই তিনি কাটিয়েছেন শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আন্দোলনে। ১৯৪০ সালের ১০ মে কেরলের চাঙ্গানেসারি গ্রামে জন্ম। ১১ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। কেরলের উপকূল পার্শ্ববর্তী জলাভূমিতে মাছ ধরে বেঁচে-থাকা দরিদ্র মৎস্যজীবীদের মধ্যেই বড় হয়েছেন।

১৯৭১-এ যাজক হওয়ার পরে পরেই পশ্চিমবঙ্গের রায়গঞ্জে বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তু শিবিরে ত্রাণের কাজ করতে আসেন। ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। কেরালায় ফিরে আড়তদার-পাইকারদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়েন। ১৯৭০-এর দশকে ট্রলার ও যন্ত্রচালিত বড় নৌযানের অতি-আগ্রাসী মৎস্যশিকারের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত উপকূল জুড়ে ছোট ও চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা আন্দোলনে ফেটে পড়েন। ১৯৭৭-এ মাথানি সালধানার নেতৃত্বে তৈরি হয় 'দেশি নৌকা ও ক্যাটামেরনের মৎস্যজীবীদের অধিকার ও সমুদ্রসম্পদ রক্ষার জাতীয় মঞ্চ'। পরে যা 'ন্যাশনাল ফিশ ওয়ার্কার্স ফোরাম' নামে পরিচিত হয়। এই আন্দোলনের জেরেই রাজ্যে রাজ্যে তৈরি হয় 'সামুদ্রিক মৎস্যশিকার নিয়ন্ত্রণ আইন'। দেশজোড়া লড়াইয়ের আবহে কোচারি 'কেরল স্বতন্ত্র মৎস্যজীবী ফেডারেশন' নামে এক সংগঠন তৈরি করেন। ১৯৮১-তে সহযোগী নেতা জয়াচান অ্যান্টনির সঙ্গে কেরলে বর্ষাকালীন ট্রলার বন্ধের দাবিতে ১১ দিনের অনশন করেন ও গ্রেপ্তার হন। আন্দোলনের জেরে বর্ষা মরসুমে তিন মাস ট্রলার বন্ধ হয়। এই সময়েই তিনি আইনের স্নাতক হন।

পুঁজিপতিরা উপকূল ধ্বংস করে কলকারখানা, নগর, বন্দর তৈরি করে পরিবেশকে দূষিত করতে থাকে। ১৯৮৯-এ কোচারির নেতৃত্বে এন এফ এফ সংগঠিত করে 'কন্যাকুমারী যাত্রা'। 'জল বাঁচাও, জীবন বাঁচাও' স্লোগান দিয়ে গুজরাত আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুটি মৎস্যজীবী জাঠা কন্যাকুমারী পৌঁছয় ১লা মে। পুলিশ অহিংস আন্দোলনে গুলি চালায়। আহত হন ২১ জন। আন্দোলনের ফলে ১৯৯১ সালে পাস হয় 'উপকূলীয় নিয়ন্ত্রিত এলাকা' বা সি আর জেড বিজ্ঞপ্তি। এরকম বহু প্রতিবাদ-আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। কেরলের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যজীবীদের আন্দোলনই হোক বা হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কিংবা নন্দীগ্রাম-নয়াচরে কেমিক্যাল হাব— টমাস কোচারি বারবার ছুটে এসেছেন। গত ৫ জুলাই স্টুডেন্টস হলে প্রয়াত মানবতাবাদী নেতা টমাস কোচারিকে শ্রদ্ধা জানাতে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছিল।

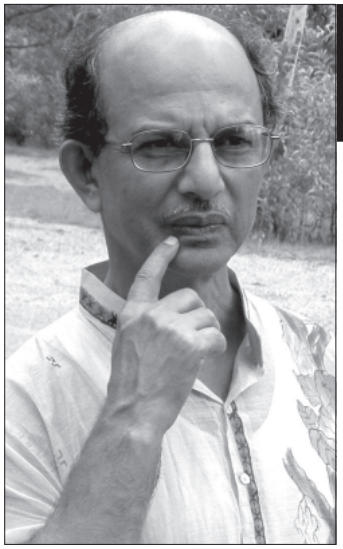

পশ্চিম মেদিনীপুরের এড়াল গ্রামে শিক্ষকতা করেন ষড়ানন পণ্ডা। উৎস মানুষ-উদ্বুদ্ধ এই মানুষটি সেখান কুসংস্কারবিরোধী আন্দোলনেরও সক্রিয় কর্মী। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর একটি স্মৃতিচারণমূলক লেখা উৎস মানুষ পত্রিকায় ছাপানোর জন্য একজনকে দিয়েছিলেন। তিনি সেটি পাঠিয়ে উঠতে পারেননি। ফলে লেখাটি ছাপা যায় না। ইতোমধ্যে ২০০৮-এর বন্যায় ষড়াননবাবুর ঘরবাড়ি ভেসে যায়। লেখাটি কোনো এক বিজ্ঞানকর্মী-ছাত্রের কাছে গচ্ছিত থাকায় সেটি সম্প্রতি পাওয়া গিয়েছে।ওঁদের একান্ত ইচ্ছে এটি পত্রিকায় ঠাঁই পাক। প্রতিবেদনটি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি ওঁদের আবেগ-ভালবাসায় মাখা। অনেক দেরি হলেও সেই আবেগকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখাটি প্রকাশ করা হল। — সম্পাদক

স্মৃতিচারণ

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে

তোরণটা ছিল নয়নাভিরাম, লতাপাতা, ফুল, কলাগাছ দিয়ে বহু যত্ন করে বানিয়েছে চাউলকুঁড়ি হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। শহর থেকে সুদূরের এই অখ্যাত গ্রামে আসছেন একজন বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী, লেখক। ছাত্রছাত্রীরা তাঁকে দেখেনি কোনোদিন, তবে তাঁর গলা তাদের চেনা। বহুবার বেতারে শুনেছে তাঁর 'সাপ নিয়ে কিছু কথা', 'রঙিন খাবারের বিপদ', 'হোলির রঙে চোখ কানা', 'পটকা ও বাজির শব্দে কালা' প্রভৃতি কথিকা। এই বিজ্ঞানীর বন্ধু মাস্টারমশাই ক্লাসে তাঁর অনেক কথা শুনিয়েছেন। টানা দুটো দিন তাঁর সঙ্গে আড্ডা জমাবে— এই আনন্দে তারা ডগমগ।

'ব্যবহারে বিজ্ঞান: বিশ্বাসে অবিজ্ঞান'-- এই বিষয়ে ৩০টি ছাপান প্রশ্ন ছেলেমেয়েরা এক সপ্তাহ আগে পেয়েছিল। প্রশ্নগুলোর বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর নিজেদেরই তৈরি করে আনতে হবে— মাস্টারমশায়ের এই ছিল নির্দেশ। হলঘর থৈ থৈ, ছাত্রছাত্রীরা অন্য স্কুলে পাঠরত ভাইবোন, দাদাদিদিদেরও সঙ্গে এনেছে। প্রধানশিক্ষক মশাই কয়েকজন মাস্টারমশাই সহ অশোকবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সভাগৃহে ঢুকলেন। পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমাল্যে বরণ করা হল অতিথিকে। প্রতিবেদক ওই স্কুলেরই শিক্ষক। বন্ধুত্বের সুবাদে তিনিই ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রধান শিক্ষক মশাইয়ের স্বাগত ভাষণের পর অশোকবাবু কথা শুরু করলেন, 'আমার চির আদরের অতিশয় স্নেহের কচিকাঁচা বন্ধুরা...' এই সম্বোধনে সকলকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধলেন। বিজ্ঞান সবার জন্য--- গাছের জন্যও বটে; লতাপাতা, ফুল ছিঁড়ে গেট সাজানো বিজ্ঞানকর্মীদের পক্ষে সঠিক হয় নি। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'। আমরা সবাই কিন্তু বিজ্ঞান-নির্ভর, অথচ বিশ্বাসটা আছে অবিজ্ঞানের উপর। শহরের শিক্ষিত মানুষজন বড় বড় পাকাবাড়ি বানাচ্ছে, কংক্রিটের চেয়েও কি ক্ষমতাশালী ছেঁড়া জুতো, ঝাঁটা, ঝুড়ি? এ দৃশ্য গ্রামেও দেখতে পাবে। লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের নিরীহ নির্দোষ গ্রহদের কোপ থেকে রক্ষা পেতে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকেরাই জ্যোতিষীদের কাছে ভিড় জমায়, শত শত টাকা প্রণামী দেয় স্বাঘোষিত জ্যোতিঃশাস্ত্রী ও তন্ত্রসিদ্ধদের পায়ে। ডাইনি সন্দেহে নিরপরাধ মেয়েটিকে নির্মমভাবে পোড়ানো হয়--- এসবই অবিজ্ঞানের বিশ্বাসের কারণে।

অবিজ্ঞান যে শুধু ধর্মের পথ ধরে বা সামাজিক পথ ধরে ঢুকছে তা নয়, রাজনীতি ও অর্থনীতির পথেও ঢুকছে। সাধারণ দোকানদার বেশি লাভের আশায় লংকালেবু গেঁথে ঝুলিয়ে রাখে। দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে গাড়িচালকের সামনে থাকে

নানা দেবদেবীর মূর্তি, নীচে ঝুলিয়ে রাখা হয় একটা ছেঁড়া জুতো। মন্ত্রীরা মন্দিরে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করে, পাঁজির শুভদিন, অমৃতযোগ দেখে মনোনয়নপত্র পূরণ করে। এই অবিজ্ঞানে বিশ্বাসের কারণে বাবরি মসজিদ নিয়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে, বয়ে যায় রক্তস্রোত। প্রথমে পিতা মাতা শিক্ষক--- এঁরাই অবিজ্ঞানে বিশ্বাসটাকে নির্মূল করবেন, তবেই ছাত্রছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে সমর্থ হবেন। সুস্থ সুন্দর সুখী পৃথিবী গড়ার লক্ষ্য যদি থাকে— তাহলে এ কাজ আজই শুরু করতে হবে।

দুদিনের খোসগল্পের আড্ডা বসল চাউলকুঁড়ি হাইস্কুলে। সন্ধ্যায় প্রায় ২ হাজারের মতো মানুষের ঢল নেমেছে জনসভায়। কয়েক মাইল দূরে এড়াল নিবেদিতা গার্লস্ হাইস্কুলেও এইভাবে অনুষ্ঠান করলেন আশোকবাবু। এরপর আরও দুবার এসেছেন এই এলাকায়।

গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। 'উৎস মানুষ' নামে মাসিক একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশ করতেন। কলকাতা ও কলকাতার বাইরে বছরে একবার উৎস মানুষের আড্ডা বসত। কলকাতা থেকে বহু দূরের গ্রামগঞ্জের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোতে তিনি ছুটে যেতেন। কলকাতা বেতারের সঙ্গে ছিল তাঁর অচ্ছেদ্য বন্ধন। নানা বিষয়ের উপর কথিকা, সাক্ষাৎকার নিয়মিত প্রচারিত হত। এইভাবে তিনি দেউলে দেউলে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানোর দুরূহ কাজটি নীরবে করে গেছেন। সব্যসাচীর মতো দুহাত তাঁর সমানে চলত। স্টেট ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে বসে তিনি যেমন সরকারি দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি সাধারণ মানুষের মাঝে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের কাজটিও করে গেছেন। এরকম চরিত্রের মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

অশোকবাবুর জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়'। আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরের এই এলাকাটা বন্যাপ্রবণ। কয়েক বছর আগে ভয়াবহ বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল। আমি ফোনে আমাদের এলাকার মানুষদের করুণ কাহিনী জানিয়েছিলাম অশোকবাবুকে। তিনি চেতনা ক্লাবকে এখানে পাঠালেন। নতুন-পুরাতন জামাকাপড়, কম্বল, ত্রিপল এবং ওষুধপত্র ওঁরা নৌকো করে ডুবন্ত মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়ে যান। আমাদের এলাকাটা ছিল অচ্ছুত। এখানে আসার মতো রাস্তাঘাট বলতে দুদিকে বাঘনখা কাঁটার ঝোপ, মাঝে সরু সর্পিল পায়েহাঁটা পথ। এই পথেই ১২/১৬/২০ কিমি হেঁটে মানুষ বাসস্ট্যান্ডে যেত। এখনও তেমন উন্নতি হয় নি। তখন দু-চাকার ঠেলাগাড়িও ঢুকত না, এখন রিকশভ্যান ঢোকার মতো রাস্তা হয়েছে। ট্রেকার বা অটো সার্ভিস এখনও চালু হয় নি। রবীন্দ্রনাথ একটি গানে বলেছিলেন— 'পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' অশোকবাবু এই বাটে পায়ের চিহ্ন আঁকলেন। তারপর ডাঃ অমিয়কুমার হাটি, ডাঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু, ডঃ অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিজ্ঞানী ও ডাক্তারবাবুদের পায়ের চিহ্ন এই বাটে পড়েছে।

রেডিওর স্থানীয় সংবাদে হঠাৎ শুনলাম— 'গ্রামবাংলায় বিজ্ঞান আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী, বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখক, উৎসমানুষ পত্রিকার সম্পাদক, বেতারে প্রাঞ্জল ভাষায় বিজ্ঞানের তথ্য পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নেই ...।' 'জন্মিলে মরিতে হবে' কথাটা নিরেট সত্যি হলেও আমরা গভীর শূন্যতার মধ্যে পড়লাম। আমাদের বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্যরা শোকাহত হল, অশোকদার লক্ষ লক্ষ শ্রোতাও সমধিক শোকাহত হয়েছেন। কলকাতা মহানগরীর বিজ্ঞানমেলায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। আমরা 'কুসংস্কারের অক্টোপাশে' বিজ্ঞান নাটিকা ও বিজ্ঞান পসরা নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলাম। আরও বহু স্মরণীয় মুহূর্ত আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে ভাস্বর হয়ে আছে। অশোকদাকে হারানোর অপূরণীয় ক্ষতির এটুকুই সান্ত্বনা— 'সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে।'

পুনঃ এই উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর সবংয়ের চাউলকুঁড়ি গ্রামে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রয়াত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল ৯ ডিসেম্বর ২০০৮-এ। চাউলকুঁড়ি গণবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতিতে। স্থানীয় বিজ্ঞান ক্লাবের সদস্য এবং বিশিষ্টজনেরা স্মৃতিচারণ করেন। কাউন্সিল ফর রুর‍্যাল ওয়েলফেয়ার-এর সম্পাদক অমূল্যচরণ মাইতি, পল্লীমঙ্গল গুচ্ছসমিতির সহসম্পাদক অনিরুদ্ধ ভক্ত, কৃষিপ্রশিক্ষক আনন্দ মান্না, অশোক পাল (নরেন্দ্রপুর লোকশিক্ষা পরিষদ), অসিতকুমার জানা (মাসরুম প্রোজেক্টার), পোস্ট মাস্টার অরবিন্দ পাল, ৬ নং অঞ্চলের উপপ্রধান মামণি ঘোড়ই, পঞ্চায়েত সদস্য বারীন মাইতি উপস্থিত ছিলেন। এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে শুরু হয় সভা। সভার সমাপ্তিতে সঙ্গীতশিক্ষক বিষ্ণুপদ মান্না রবীন্দ্রনাথের 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে' গানটি পরিবেশন করেন।

ষড়ানন পণ্ডা

শ্বেতশুভ্র পাঁচটি বিষ: অচেনা পরিশোধিত চিনি

গৌতম মিস্ত্রী

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি আপ্তবাক্য স্মরণীয় — পাঁচটি সাদা বিষ থেকে দূরে থাকুন। (১) প্যাকেটবন্দি পরিশোধিত নুন, (২) চিনি, (৩) দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, (৪) সাদা সরু ও চকচকে পালিশ করা চাল এবং (৫) সাদা আটা, ময়দা ও তার থেকে ঘরে প্রস্তুত করা রুটি অথবা বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত করা বিস্কুট, পাউরুটি, কেক, কুকিজ ইত্যাদি অসংখ্য বেকিং করা খাবার। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা চিনি নিয়ে।

পর্ব ২

আমি চিনি গো চিনি তোমারে... দুঃখজনকভাবে চিনি আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আত্মীয়বন্ধুর বাড়িতে গেলে, বাড়িতে অতিথি এলে, উৎসবে, শোকে কেক মিষ্টির ব্যবহার ভারতীয়, বিশেষ করে বঙ্গীয় সংস্কৃতির অঙ্গ। শেষপাতে মিষ্টি, দই, চাটনি, আইসক্রিম না হলে আমাদের চলে না। চিনি ছাড়া অনেকে রান্না করতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। পশ্চিমী খাবারে অনুষঙ্গী মিষ্টি পানীয়ের (কোল্ড ড্রিঙ্কস) সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের খাদ্যতালিকায় মিষ্টি বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে অনেকটাই এগিয়ে। নিজের দেশে সমালোচনায় জর্জরিত মিষ্টি পানীয় প্রস্তুতকারী বিদেশী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো আমাদের খাদ্যাভ্যাসে থাবা বসাচ্ছে। বর্তমানের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা চিনি নামক এই খাবারের স্বাদবদলকারী রাসায়নিক পদার্থটির যথেচ্ছ ব্যবহারে সতর্কতা জারি করেছেন।

মানুষ কীভাবে এই আত্মঘাতী পদার্থটির খোঁজ পেল

সাদা ধবধবে চিনিকে বৈজ্ঞানিকেরা খাদ্যশ্রেণীভুক্ত করেন না, যেমনটি শুকনো তেঁতুল বা লঙ্কার ক্ষেত্রেও ঘটে। শেষোক্ত বস্তুগুলো অবশ্য তাজা অবস্থায় ভিটামিনে পরিপূর্ণ, আর চিনি কেবল নিছকই এক পরিশোধিত রাসায়নিক পদার্থ। চিনির প্রাকৃতিক উৎস আখ অথবা বিটের রস। প্রাথমিকভাবে সেই ঘোলাটে পদার্থটিকে সাদা, দৃষ্টিনন্দন ও লোভনীয় করার জন্য চুন মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় চিনির প্রায় সব ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। এরপর পর্যায়ক্রমে কার্বন ডাইঅক্সাইড, ক্যালসিয়াম সালফেট, সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে স্বচ্ছ, দানাদার, বিক্রয়যোগ্য চিনি প্রস্তুত করা হয়। পরিশোধিত চিনি কেবলই শক্তি বা ক্যালোরি জোগায়, এতে পাওয়া যাবে না কোনো ভিটামিন, প্রোটিন, ফাইবার বা অন্যান্য আবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ। এই ধরনের খাবারকে খাদ্যবিশারদগণ 'ফাঁকা শক্তি'র বা 'ভিটামিন ও অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যগুণ বর্জিত কেবলই ক্যালোরির' (empty calorie) আধার বলে চিহ্নিত করেন। শুধুই শক্তির জোগানদার হলেই কোনো পদার্থকে খাদ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। দেহের অভ্যন্তরীণ হেঁসেলের রসদ খরচ হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। সেটাকে রিচার্জ (টপ-আপ) করার জন্য খিদে নামক অনুভূতির সৃষ্টি। কালের বিবর্তনে খিদের অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক রূপান্তর হয়ে খিদে হয়ে উঠেছে লোভ। যদিও ঘাটতি পূরণের ঠিক তাগিদ আমাদের অনুভব করার কথা, দুর্ভাগ্যক্রমে এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অনুভূতি (অর্থাৎ ঠিক কোন খাদ্যে ঘাটতি পড়েছে) থেকে আধুনিক মানুষ বঞ্চিত। মনে করুন, আপনার দেহ-ভাঁড়ারে ১০০০ কিলোক্যালোরির টান পড়েছে। আপনার খিদে পাবে। কিন্তু আধুনিক খাদ্যরুচির খাবার থেকে খাবার গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ১০০০ কিলোক্যালোরি পূর্ণ হবার পরেও বেশিরভাগ মানুষেরই খিদে মিটবে না। এই অসাম্যের দুটো কারণ বৈজ্ঞানিকেরা চিহ্নিত করেছেন। মানুষের খাওয়াদাওয়ার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের 'হাইপোথ্যালামাস' কেন্দ্র। সুষম খাবারের কথা মাথায় রেখে এটা সৃষ্ট হয়েছিল। প্রথমত, আমাদের আধুনিক শক্তিঠাসা (এনার্জি ডেন্স) খাবারে ক্যালোরির আধিক্যের কারণে খিদে মেটার অনুভূতি উদ্রেককারী মস্তিষ্কের অঙ্গটি বোকা বনে যায়। খাবার দিয়ে পাকস্থলী পূর্ণ হতে থাকলে, পাকস্থলীর দেওয়ালে যে টান তৈরি হয়, তার বার্তা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃত্তির অনুভূতি নিয়ন্ত্রণকারী অঙ্গ 'হাইপোথ্যালামাস'-এ পৌঁছে যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণে টান সৃষ্ট হলে হাইপোথ্যালামাসের উপযুক্ত সংবেদনে ক্ষুধা নিবৃত্তির অনুভূতি হয়। পাকস্থলীর এই টান নির্ভর করে খাবারের আয়তন, তার ভৌত অবস্থা (শক্ত অথবা তরল) আর খাদ্যের শ্রেণীর (প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহজাতীয়) উপর। শক্ত খাবার তরল খাবারের চেয়ে বেশি টান তৈরি করে, আবার প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় খাবার শর্করা জাতীয় খাবারের চেয়ে

পাকস্থলীতে বেশিক্ষণ থাকে ও বেশি টান সৃষ্টি করে। প্রয়োজন সুষম অর্থাৎ দৈনিক ২০ থেকে ৩৫ গ্রাম শক্তিবিহীন ফাইবার জাতীয় ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাদ্য। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের প্রয়োজনে ক্ষুধা নিয়ন্ত্রিত শারীরিক খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করতে হলে এমনধারা সুষম খাদ্য চয়নের দরকার আছে (ডায়েট চার্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী ওজন করে খাবারের দরকার হবে না)। আধুনিক শক্তিঘন খাবার, বিশেষ করে চিনি মিশ্রিত পানীয় একদিকে যেমন খিদে মেটায় না, অন্যদিকে হাইপোথ্যালামাসের চোখে ধুলো দিয়ে চুপিসারে শরীরে ঢুকিয়ে দেয় খাদ্যগুণ বর্জিত ফাঁকা ক্যালোরি। শর্করা সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার সময় হাইপোথ্যালামাস চটজলদি বুঝতে পারে না, কত কিলোক্যালোরির ভাঁড়ারে ঢুকতে চলেছে। যখন বোঝে, তখন সেই অতিরিক্ত কিলোক্যালোরির বোঝা দীর্ঘমেয়াদি স্টোররুমে (চর্বি হিসাবে) পাঠাতে বাধ্য হয়। ভেবে দেখুন, হ্যারিকেনে কোরোসিন তেলের বদলে পেট্রোল ভরলে কী ভয়ানক ভুল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কারণটি আমাদের ব্যস্ততা। তাড়াতাড়ি খাবার খাওয়ার সময়, পাকস্থলী থেকে প্রয়োজনীয় সংবেদন স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে পৌঁছতে ও সেই স্নায়ুর সংবেদন বিশ্লেষণের জন্য কিছুটা সময় লাগে। কিন্তু হাইপোথ্যালামাস ও তার সাহায্যকারী অঙ্গগুলো আমাদের খাবার খাওয়ার বেগের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হার মেনে যায়। চিনি কোনো প্রাকৃতিক খাদ্য নয়। এক বাটি চিনি কেউ খাবার হিসেবে গ্রহণ করে না। বিভিন্ন সস্, কাসুন্দি, আজিনামোটো ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের মতো এটি একটি খাদ্যের স্বাদ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত প্রক্রিয়াকৃত রাসায়নিক পদার্থ মাত্র। আমাদের বিচার্য, এটি আদৌ স্বাস্থ্যকর কি না। এর কোনো খাদ্যগুণ আছে কি নেই।

চিনি নিছকই এক সরল শর্করা

খাদ্যসামগ্রীকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়: শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ। চিনি শর্করা জাতীয় খাবারের মধ্যে পড়ে। কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বিশেষ ধরনের অণু হল শর্করা যার অপর নাম কার্বোহাইড্রেট। যুক্ত-শর্করা অণুর মধ্যে শর্করা ও স্যাকারাইড অণুর সংখ্যা অনুযায়ী সেটা সরল ও জটিল হতে পারে। সরল শর্করাতে একটি (এক-এক অণুর শর্করা, মনোস্যাকারাইডস) বা দুটি (দুই অণুর শর্করা, ডাই-স্যাকারাইডস) স্যাকারাইড অণু থাকে। গ্লুকোজ (বেনামে ডেক্সট্রোজ), ফ্রুকটোজ ইত্যাদি এক-অণুর শর্করা আর আখ, বিট, মধু ইত্যাদি দুই-অণুর শর্করা (গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজের মিশ্রণ)। দুধে ল্যাকটোজ (দুই-অণুর শর্করা) নামে গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজের মিশ্রণ থাকে। প্রাকৃতিকভাবে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এমন এক অণুর শর্করা হল ফ্রুকটোজ। গ্লুকোজের স্বাদ মিষ্টি ও তেতোর সংমিশ্রণ। চিনির মিষ্টি স্বাদ প্রধানত ফ্রুকটোজের জন্য। ফ্রুকটোজই মিষ্টি ফলের মিষ্টি স্বাদের কারণ। চাল, আটা ইত্যাদি হল জটিল শর্করা বা স্টার্চ। মনে করা হয়, জটিল শর্করা রক্তে চিনির মাত্রা অপেক্ষাকৃতভাবে কম বাড়ায়[১,২]। সেই কারণে খাবারে সরল শর্করার চেয়ে বেশি পরিমাণে জটিল শর্করার অন্তর্ভুক্তি স্বাস্থ্যকর। আমাদের বর্তমান খাদ্যরুচির অনেক খাবারেই প্রাকৃতিক মিষ্টত্ব বাড়ানোর জন্য আলাদা করে চিনি মেশানো হয় আর সমস্যাটা সেখানেই। সরল ও জটিল শর্করার রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়ানোর ক্ষমতা নিয়ে মতান্তর শুরু হয় বিগত শতাব্দীর ৭০ দশকের মাঝামাঝি থেকে, যখন বোঝা গেল (অন্ত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ হজম করার জারক থাকার জন্য) আলু, পাউরুটি ও চিনি গ্রহণ করার পরে রক্তে সুগারের মাত্রা একইরকমভাবে বাড়ে,[৩,৪]। এই কারণে শর্করা জাতীয় খাদ্যের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া অনুধাবনের জন্য বর্তমানে নিম্নবর্ণিত সূচকগুলো ব্যবহার করা হয়।

গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স (জিআই): শর্করা জাতীয় খাবারের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম অনুযায়ী অন্ত্রের মধ্যে সরল শর্করায় পরিণত হওয়া ও রক্তে শোষিত হবার ক্ষমতা কম বা বেশি হয়। গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স তারই এক মাপকাঠি। বিশুদ্ধ গ্লুকোজের রক্তে শোষিত হবার ক্ষমতাকে একক ধরে অন্যান্য শর্করার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স বোঝানো হয়ে থাকে। পূর্ণদানা (হোল গ্রেইন) বার্লি, ওট, রাই ইত্যাদির মতো অধিক পরিমাণে ফাইবার বা 'হজম না হওয়া' শর্করা সমৃদ্ধ খাদ্যের গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কম। জিলাটিন সমৃদ্ধ 'পাস্তা'ও কম গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সওয়ালা খাবার। কম ফাইবার থাকা সত্ত্বেও, ধীরগতিতে হজম প্রক্রিয়া ঘটার জন্য জটিল রাসায়নিক গঠনের (Highly branched polymer) সিদ্ধ চাল ও ডাল (legums) জাতীয় খাবারেরও গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স কম। চিনি, সাদা আটা, ময়দা,

চকচকে সাদা পালিশ করা সরু চাল ইত্যাদির গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ১০০ শতাংশের কাছাকাছি হলেও পাস্তা ও আপেলের ক্ষেত্রে সেটা যথাক্রমে ৭০ ও ৫৫ শতাংশ। গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স খাবার অব্যবহিত পরে রক্তে শর্করার মাত্রা নির্ধারণ করে, কিন্তু মোট শর্করা শোষিত হবার পরিমাণ নির্ধারণ করে না। সেটা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজন হয় 'গ্লাইসেমিক লোড' নামে আর এক মাপকের।

গ্লাইসেমিক লোড (জি এল): শর্করা জাতীয় খাবার গ্রহণ করার পরে, রক্তে মোট শর্করা বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর করে খাবারে হজমযোগ্য শর্করার পরিমাণ ও তার গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্সের ওপর। খাদ্যের শর্করা জাতীয় খাবারের আনুপাতিক পরিমাণের সঙ্গে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স গুণ করে গ্লাইসেমিক লোড নির্ণয় করা হয়। আলু, সাদা সরু ও চকচকে পালিশ করা চাল, সাদা আটা, ময়দা ইত্যাদিও খাদ্যে হজমের অযোগ্য তন্তু (ফাইবার) কম থাকায় এইসব খাবারের গ্লাইসেমিক লোড বেশি। পূর্ণদানার চাল, গম ইত্যাদি সিরিয়াল (সিরিয়াল, গ্রেন), সবজি বা অঙ্কুরিত ছোলায় বেশি ফাইবার থাকার ফলে এইসব খাবারের কম গ্লাইসেমিক লোড হয়। দৈনিক খাদ্যতালিকায় এই শেষোক্ত ধরনের খাবারের অন্তর্ভুক্তিতে শর্করা জাতীয় খাবারে রাশ টানা যায়, ফলে স্থূলতা নিয়ন্ত্রণ ও আনুসঙ্গিক রোগভোগের বোঝা অনেকাংশে কমানো যায় [৫,৬,৭]। সাদা দানাদার চিনি যেমন একদিকে হজমের অযোগ্য তন্তু বিহীন অন্যদিকে এর গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স ১০০ শতাংশের কাছাকাছি। অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, উচ্চ গ্লাইসেমিক লোডযুক্ত চিনি সেই কারণে বর্জনীয়।

চিনির বিকল্প মিষ্টি— ফ্রুকটোজ বনাম গ্লুকোজ:

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে গ্লুকোজের বোঝা হ্রাসের লক্ষ্যে চিনির বিকল্প হিসাবে ফ্রুকটোজ, সরবিটল, ন্যানিটল ইত্যাদির প্রবর্তন হয়। যদিও ফ্রুকটোজ গ্লুকোজের মতো ক্যালোরির বোঝা বাড়ায় না, এটি রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, চিনির অংশ হিসাবে অথবা আলাদা করে ফ্রুকটোজ গ্রহণ উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে না। চিনির ক্ষতিকারক দিক সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বিগত চার দশক ধরে বিকল্প মিষ্টির সন্ধানে বিস্তর অনুসন্ধান হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে ফ্রুকটোজ। এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো আপত্তি হল ফ্রুকটোজ নিজে সরাসরি ক্যালোরির বোঝা না বাড়ালেও খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে খাবার গ্রহণের পরিমাণ বাড়ায়, মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস ক্ষুধা নিবৃত্তির ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে আরও বেশি খাবার প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং মাদক দ্রব্যের মতো আরও মিষ্টি খাবার জন্য এক ধরনের আসক্তি তৈরি করে। সোজা ভাষায় বললে, ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য মিষ্টি খেলে, আমাদের ক্ষুধাতুষ্টির সীমায় পৌঁছনোর জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে খাবার প্রয়োজন হয়। শূন্য ক্যালোরির অন্যান্য বিকল্প রাসায়নিক মিষ্টিও (লো ক্যালরি আর্টিফিসিয়াল সুইটনার) এই দোষে দুষ্ট।

বহু বছর ধরে খাবারে অতিরিক্ত সম্পৃক্ত ফ্যাটের ক্ষতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকরা অবহিত ছিলেন, বিকল্পের খোঁজে খাদ্যরসিকগণ মিষ্টিকে আঁকড়ে ধরলেন। কিন্তু দেখা গেল, এটাও নিরাপদ নয়। ফ্যাট কমালে (অঙ্কের নিয়মে) আনুপাতিক হারে শর্করা বেড়ে যেতে বাধ্য। এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ক্যালোরির নিরিখে সমমাপের ফ্যাট নিয়ন্ত্রিত (অর্থাৎ শর্করা সমৃদ্ধ) খাবারের চেয়ে শর্করা নিয়ন্ত্রিত (অর্থাৎ ফ্যাট সমৃদ্ধ) খাবার অধিক স্বাস্থ্যকর, শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে অধিক সক্ষম আর তাতে সুস্থ হৃদয়ের অনুকূল কোলেস্টেরলের মাত্রা সুরক্ষিত হয়[৮]। সেটা অন্য অধ্যায়, অন্য আলোচনা।

অ্যাডভান্সড গ্লাইকেশন এলড্ প্রোডাক্টস (এজিই): উৎসেচকের ওপর নির্ভর না করেই গ্লুকোজ প্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাধারণ এবং উচ্চতাপাঙ্কে অ্যাডভান্সড গ্লাইকেশন এনড্ প্রোডাক্টস নামে যৌগ তৈরি করে, যেটা সব ধরনের চিনি মেশানো খাবারে থাকতে বাধ্য। এই যৌগগুলো দেহকোষের নমনীয়তা নষ্ট করে কোষের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটায় ও রক্তনালীর বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করে। ডায়াবেটিস রোগে যে বৃক্কের (কিডনি) অসুখ হয়, তাতে অ্যাডভান্সড গ্লাইকেশন এনড্ প্রোডাক্টসকে দায়ী করা হয়[৯, ১০,১১]।

চিনির অন্যান্য ক্ষতি

অতিরিক্ত চিনি গ্রহণের সঙ্গে মস্তিষ্কের নানাবিধ সূক্ষ কর্মক্ষমতার (কগনিটিভ ফাংশান) বিরোধ আছে বলে কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক মনে করেন, যদিও সেটা অপ্রমাণিত[১২]।

চিনির সঙ্গে দাঁতের কেরিস রোগের যোগসূত্র বরং প্রমাণিত[১৩, ১৪, ১৫, ১৬]।

প্রমাণিত কিছু তথ্য:

১) দৈনিক মিষ্টি গ্রহণে রক্তে শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়া ছাড়াও ক্ষতিকারক স্নেহজাতীয় পদার্থ ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পায় আর উপকারী গুরুঘনত্বের (হাই ডেনসিটি লাইপো প্রোটিন কোলেস্টেরল) কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পায়।

২) অধিক চিনি গ্রহণে হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। দৈনিক দু বোতল মিষ্টি পানীয় গ্রহণে হৃদরোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়[১৭,১৮]।

৩) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা অনুযায়ী দৈনিক চিনি গ্রহণের ঊর্ধ্বসীমা ক্যালোরির মাপে মোট খাবারের ১০ শতাংশে সীমিত রাখা উচিত। আমেরিকার সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী এই ঊর্ধ্বসীমা ১৫ শতাংশ।

৪) প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের অগোচরে চিনি আমাদের পেটে ঢুকে যাচ্ছে বিস্কুট, পাউরুটি, টম্যাটো সস, স্যালাড ড্রেসিং ও প্যাকেটজাত ফলের রসের মাধ্যমে।

৫) খাদ্যের প্রাকৃতিক চিনির চেয়ে আলাদা করে মেশানো চিনিই বেশি ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত।

সূত্র:

1. National Institutes of Health : NIH Consensus Development Conference Statement on Diet and Excercise, US Department of Health and Human Services, Bethesda, MD 1986.
2. American Diabetes Association, Bantle JP, Wylie-Rosett J. et at. Nutrition recommendations and interventions for diabetes : a position statement of the American Diabetes Care 2008, 31 Suppl 1:S61.
3. Wolever, TM, Katzman, L. Jenkins, AL, et al. Glycemic index of 102 complex carbohydrate foods in patients with diabetes Nutr Res 1994, 14:651.
4. Bantile JP Clinical aspects of sucrose and fructose metabolism. Diabetes Care 1989; 12:56.
5. Liu S. Willet WC, Manson JE, et al. Ralation between changes in intakes of dietary fiber and grain products and changes in weight and development of obesity among middle-aged women. Am J Clin Nutr 2003, 78:920.
6. Pereira, M, Jaccobs, D, Slattery, M, et al. The association of whole grain intake and fasting insulin in a biracial cohort of young adults: The CARDIA study. CVD Prevention 1998; 1:231.
7.McKeown NM, Meigs JB, Liu S, et al. Whole-grain intake is favorably associated with metabolic risk factors for type 2 diabetes and cardiovascular disease in the Framingham Offspring Study. Am J Clin Nutr 2002. 76:390.
8. Pereira MA, Swain J, Goldline AB, et al. Effects of a low-glycemic load diet on resting energy expenditure and heart disease risk factors during weight loss. JAMA 2004; 292:2482.
9. He C, Sabol J, Mitsuhashi T, et al. Dietary glycoloxins: inhibition of reactive products by aminoguanidine facilitates renal clearance and reduces tissue sequestration. Diabetes, 1999; 48: 1308-1315.
10. Stitt AW, He C, Viassara H. Characterization of the advanced glycation end-product receptor complex in human vascular endothelial cells. Biochem Biophys Res Commun. 1999; 256: 549-556.
11. Koschinsky T, He CJ Mitsuhashi T, et al. Orally absorbed reactive glycation products (glycotoxins) an environmental risk factor in diabetic nephropathy. Proc Natl Acad Sci USA 1997; 94: 6474-6479.
12. Wolraich ML, Wilson DB, White JW. The effect of sugar on behavior or cognition in children: a meta-analysis. JAMA 1995; 274: 1617-1621.
13. Rugg-Gunn AJ, Murray JJ. The role of sugar in the aetiology of dental caries.
14. The epidemiological evidence. J Dent, 1983, 11: 190-199, 3. Sreebny LM Sugar availability, sugar consumption and dental caries.
15. Community Deny Oral Epidemiol, 1982\ 10: 1-7.
16. Sreebny LM. Sugar and human dental caries. World Rev Nutr Diet, 1982; 40: 19-65.
17. Yudkin J. Sugar and ischaemic heart disease. Practioner. 1967; 198: 680-683.
18. Yudkin J. Dietary factors in atherosclerosis sucrose, Lipids; 1978, 13: 370-372.

পাঠানি: খালি চোখেই বাজিমাত

সমীরকুমার ঘোষ

ছোট থেকেই সামন্ত চন্দ্রশেখরকে টানত অসীম রহস্যে ভরা আকাশ। ঘরে বসে গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ক পুঁথি পড়ে অর্জিত জ্ঞানকে মেলানোর মধ্যে দারুণ আনন্দ পেতেন। উৎসাহ বেড়ে যেত বহুগুণ। একটু ভাল করে দেখা ও বোঝার জন্য নিজেই তৈরি করে নিয়েছিলেন বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। যার মধ্যে ছিল বাঁশের তৈরি দূরবীন। এইভাবে বেশ চলছিল, সমস্যা শুরু মাঝে মাঝে পুঁথিতে-পড়া তথ্যের সঙ্গে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য না মেলায়। অনেক ভেবেচিন্তে শেষমেশ নিজের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যগুলো আলাদা খাতায় লিখে রাখতে শুরু করেন। এই একই ধরনের সমস্যায় পড়েছিলেন সোয়াই জয়সিং। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায়। তিনি সমস্যার সমাধানে ইটবালি দিয়ে বিশাল পর্যবেক্ষণাগার (অবজারভেটরি) বানিয়ে ফেলেছিলেন।

সেই বেদের সময়েই ভারতীয় জ্যোতির্বিদদের অয়নমাস বা অয়নচলন সম্পর্কে ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁরা তাত্ত্বিকভাবে যতটা এগিয়েছিলেন, হাতে-কলমে তা দেখে নেওয়ার ব্যাপারে ততটা জোর দেননি। এটা বোঝা যায়, তাঁরা কোনো ধরনের যন্ত্রপাতির কথাই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক পুঁথিতে উল্লেখ করেননি। খাতায়-কলমে করা হিসাবকেদূরবীক্ষণ, মান মন্দির ইত্যাদি দিয়ে যাচাই না করার কারণেই হিসেবে অনেক ত্রুটি ঢুকে পড়েছে। সেই কারণেই চন্দ্রশেখর মোহান্ত যখন পুঁথির হিসেবকে নিজের তৈরি যন্ত্রপাতির সাহায্যে মেলানোর চেষ্টা করেছেন, তখন অনেক ত্রুটি ধরা পড়েছে। তার ওপর বরাহমিহির মূল জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে সরে এসে জোর দিলেন ফলিত জ্যোতিষে। ফলে পাশ্চাত্যে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিওরা জ্যোতির্বিজ্ঞানকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে গেলেন। আমরা পড়ে রইলাম সেই তিমিরেই।

এ প্রসঙ্গে হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার নিরিখে একটু দিন মাস ও বছরের হিসেবটা দেখে নেওয়া যাক। পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর পশ্চিম থেকে পূবে ঘুরছে। আমরা দেখে মনে করছি, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারাকে নিয়ে আকাশ একবার করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ঘুরছে। সময়ের পরিমাপক হিসাবে 'দিন'কে মৌলিক একক ধরে মাস, বছর, ঋতু প্রভৃতির হিসাব হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এর নানা নাম আছে, হিসেবেও বিভিন্নতা আছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়কে ভারতে বলে 'সাবন দিন'। এ ছাড়া জ্যোতির্বিদরা আরেকটি মৌলিক দিনের কথা বলেন, তা 'নাক্ষত্র দিন' (সাইডিয়্যার‍্যাল ডে)। এটা পৃথিবীর অক্ষের ওপর একবার আবর্তনকাল। অর্থাৎ কোনো নক্ষত্রের ক্ষিতিজ উদয় (হরিজন্টাল রাইজিং) থেকে পরবর্তী ক্ষিতিজ উদয় পর্যন্ত কাল। এটা ধ্রুব ও নিত্য। নাক্ষত্র দিনের মান সাবন দিনের মানের চেয়ে সামান্য কম।

চাঁদের গতি থেকে মাসের উৎপত্তি। এক অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা পর্যন্ত যে সময়, তাকেই আমরা 'মাস' (চান্দ্রমাস) বলি। সূর্য ক্রান্তিবৃত্তের (একলিপ্টিক) ওপর দিয়ে একই বিন্দুতে ঘুরে এলে সেই সময়কে প্রাচীন কালে লোকে বছর বলত। আসলে তা ছিল সূর্যের আপাতঘূর্ণন, পৃথিবীই সূর্যের চারদিকে নিজের কক্ষে ঘুরে আসে। একেই বলে নাক্ষত্র বৎসর (সাইডিয়্যার‍্যাল ইয়ার)। ক্রান্তিবৃত্তের ওপর মহাবিষুব একটা বিন্দু, এটা নিরক্ষরেখা (ইকুয়্যাটর) ও ক্রান্তিবৃত্তের একটি ছেদবিন্দু। অন্য ছেদবিন্দুকে বলে জলবিষুব। সূর্য ওই বিন্দুতে এলে দিন-রাত সমান হয়। মহাবিষুব বিন্দু কিন্তু অচল নয়, এটা অতি ধীরে ধীরে ক্রান্তিবৃত্তের ওপর দিয়ে সূর্যগতির বিপরীত দিকে (পশ্চিমে) বছরে ৫০" সরে যাচ্ছে। এজন্য সৌরবৎসর বলতে 'ঋতুর বৎসর' বোঝায় এবং এটা মহাবিষুব থেকে পুনরায় ঐ জায়গায় আসতে সূর্যের যে সময় লাগে তাকেই বোঝায়। তাই সৌরবৎসর (ট্রপিক্যাল ইয়ার) নাক্ষত্র বৎসরের থেকে খানিকটা কম, ঐ ৫০" যেতে সূর্যের যত সময় লাগে তত কম।

মহাবিষুবের (বা জলবিষুবের) ধীর পশ্চিমমুখী অবিরাম গতিকে 'অয়ন' (প্রিসিসন) বলে। সূর্যসিদ্ধান্ত ও বরাহমিহিরের পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় সৌরবৎসর ধরে ঋতুগণনাকে (সায়ন) শাস্ত্রীয় বলা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় পঞ্জিকাকারগণ ভুল বুঝে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে নাক্ষত্র বৎসব ধরে (নিরয়ণ) গণনা করেছেন। খ্রিষ্টীয় প্রায় ৫০০ অব্দে হিন্দুগণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকা সংস্কার আরম্ভ করেন। যাকে ভারতের জ্যোতির্বিদ্যার 'সিদ্ধান্তযুগ' বলা হয়। মহাবিষুবে সৌরবর্ষ আরম্ভ হয়। সৌর ও চান্দ্র গণনাপদ্ধতি লিপিবদ্ধও হয়। কিন্তু সৌরবর্ষের মান ৩৬৫.২৫৮৭৫ দিনে ধরায় সব পণ্ড হয়ে যায়। কারণ সংখ্যাটা ছিল সৌরবর্ষের মানের চেয়ে .০১৬৫ বেশি।

পরে এই ভুলের কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায়, যদিও অয়নচলনের (প্রিসিসন অফ ইকুইনক্স) মৃদুগতির বিষয়টা বেদের সময়কার হিন্দু জ্যোতির্বিদদের অজানা ছিল না। তাঁরা জ্যোতিষ

বা পঞ্জিকাগত উপাদান (ইফেমেরাল এলিমেন্টস) সংশোধন শুরু করেন। যাঁকে তাঁরা বলেন বীজ সংশোধন। পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অয়ন চলনের দরুণ যে বদল, সেগুলো যোগ করতে করতে পঞ্জিকাগত উপাদানগুলো ঠিক রাখার দরকার ছিল। সেটাই করা হয়নি। সোয়াই জয় সিং বা পাঠানি সামন্তর প্রায় হাজার বছর আগেই জ্যোতির্বিদরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করার পথ থেকে সরে এসেছিলেন। ফলে পঞ্জিকা গণনার উপাদানগুলো অসংশোধিতই রয়ে যায়।

প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'সিদ্ধান্ত' হিসাবে যে উল্লেখ্য কাজ হয়েছে, তাকে ধ্রুপদী ঘরানার কাজ বলা হয়। ভূকেন্দ্রিক (জিওসেন্ট্রিক) বিশ্বভাবনাকে ধরে নিয়ে সামন্তর কাজ ছিল সেই ধ্রুপদী ঘরানার। যদিও তাঁর নিজের মডেলে পৃথিবী ছাড়াও অন্যান্য গ্রহ ছিল, যেগুলো সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছিল।

বরাহমিহিরের 'সূর্যসিদ্ধান্ত', আর্যভট্টের 'আর্ধরাত্রিকা', ব্রহ্মগুপ্তের 'খণ্ডখান্দক' ভুলক্রমে বছরের মান ৩৬৫.২৫৮৭৫৬ দিন ধরেছিল, সেটা বিশুদ্ধ 'নাক্ষত্র বৎসর'-এর চেয়ে .০০২৩৯৪ দিন বেশি এবং বিশুদ্ধ 'সৌরবৎসর'-এর চেয়ে .০১৬৫৬০ দিন বেশি। তার আগে পৈতামহ সিদ্ধান্তের বর্ষমান ছিল ৩৬৫.৩৫৬৯ দিন এবং তারও আগে বেদাঙ্গজ্যোতিষে বর্ষমান নির্ধারিত হয়েছিল ৩৬৫ দিন। সকলেই ভূকেন্দ্রিক পরিকল্পনার (জিওসেন্ট্রিক থিয়োরি) ওপর জ্যোতিষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রীয় সত্য (হেলিওসেন্ট্রিক থিয়োরি) আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে পাঁচশো বছর আগে। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিদদের সাড়ে চার হাজার বছরের ওপর লেগেছিল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কাল) প্রকৃত সৌরবর্ষের মান নির্ণয় করতে। ইংরেজি না জানায় এবং ওড়িশার এক কোণে থাকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে পাশ্চাত্ত্যে কী বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, সে খবর পাঠানির কাছে পৌঁছয় নি। তবুও শুধু জ্ঞান ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে জীবদ্দশাতেই সমসাময়িক মহাজাগতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে ভবিষ্যৎদ্বাণী করেছিলেন এবং আশ্চর্যজনকভাবে সেগুলো মিলেও গিয়েছিল। তাঁর জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল শুক্র গ্রহের পরিক্রমণ (ট্রানজিট অভ ভেনাস), তারিখটা ছিল ৯ ডিসেম্বর ১৮৭৪। এই বিরল ঘটনাটি ভারত থেকে দেখা গিয়েছিল। দেখা গিয়েছিল বিশ্বের নানা জায়গা থেকেও। তার আরও আট বছর পরে, ১৮৮২ সালেও ট্রানজিট অভ ভেনাস হয়েছে। তবে তা ভারত থেকে দেখা যায়নি। ২০০৪ সালের ৮ জুন ভারত ও বিশ্বের অন্য কয়েকটি দেশ থেকে এটি দেখা গিয়েছিল। যা নিয়ে অপেশাদার জ্যোতির্বিদ ও শিক্ষাদাতার মধ্যে ছিল তুমুল উৎসাহ। এর মাধ্যমে সূর্য ও পৃথিবীর দূরত্ব বার করার এক ঐতিহাসিক সুযোগ মিলেছিল।

ফিরে যাওয়া যাক ১৮৭৪-এ। সেই সময় ঘটনাটি নিয়ে জ্যোতির্বিদদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ছিল। বিদেশ থেকে অনেকেই ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের অধীন পর্যবেক্ষণাগারগুলো থেকে দেখার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই সময় ব্যক্তিগত উদ্‌যোগে এবং বহু রাজন্যশাসিত রাজ্যে (প্রিন্সলি স্টেট) পর্যবেক্ষণাগার তৈরি করে দেখার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। মাদ্রাজ অবজার্ভেটরির চিন্তামন রঘুনাথচারী তো এ নিয়ে সাধারণের বোধ্য একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেটি এত জনপ্রিয় হয় যে, বহু ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছিল, এমনকি উর্দুতেও। কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে এত কর্মকাণ্ড ও উত্তেজনা চললেও ওড়িশার খণ্ডপাড়া অঞ্চলে খুব সম্ভবত তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছয়নি। তাই পাঠানি এ সম্পর্কে কিছু জানবেন, সে সম্ভাবনাও ছিল না। অন্তত এমন কোনো প্রমাণ কোথাও মেলেনি।

ট্রানজিট অভ ভেনাস-এর মতো ঘটনা যে ঘটতে চলেছে পাঠানি নিশ্চয়ই আগে থেকে নিজের গাণিতিক হিসাব কষে তা বার করে ফেলেছিলেন। এবং ঘটনার দিন দেশের অন্যত্র যে উত্তেজনা, উদ্দীপনা চলছে, তার আঁচ না পুইয়েও নিঃসঙ্গ পাঠানি একা তা পর্যবেক্ষণও করেন। পাঠানি যে এটা দেখেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর লেখা সিদ্ধান্ত দর্পণ-এ।

অরুণকুমার উপাধ্যায় 'সিদ্ধান্ত দর্পণ'-এর যে অনুবাদ প্রকাশ করেন তাতে এ সম্পর্কিত শ্লোকটি অনুবাদ করেছেন এইভাবে—

'শুক্রর কারণে সূর্যগ্রহণ— শুক্রের কারণে যে সূর্যগ্রহণ তা নির্ধারণ করতে তাদের ছায়া (কৌণিক ব্যাস) এবং অন্য তারা গ্রহের মাপের (কাছাকাছি থাকা অন্য তারা ও গ্রহগুলো?) কথা বলা হয়েছিল। ৪৯৭৫ কলিবর্ষে (১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) শুক্র বৃশ্চিক রাশিতে থাকার কারণে একবার সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তখন শুক্রের যে ছায়া দেখা গিয়েছিল, তা ছিল সূর্যের প্রতিবিম্বের ১/৩২ ভাগ, যা ৬৫০ যোজনার সমতুল। ফলে এর থেকে ভালভাবেই প্রমাণিত হয় শুক্রের বিম্ব ও গ্রহগুলো সূর্যের চেয়ে অনেক ছোট।'

পাঠানির উল্লিখিত বিম্ব অথবা সূর্য ও শুক্র গ্রহের আপাত কৌণিক ব্যাসের অনুপাত ১/৩২ নির্ধারণ রীতিমতো বিস্ময়কর। ১৮৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঘটনার সময় তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সূর্য ও শুক্রের যে আপাত কৌণিক ব্যাস নির্ধারণ করেছিলেন তা ছিল— বৃত্তের পরিধি বা চাপের (আর্ক) ৩২ মিনিট, ২৯ সেকেন্ড এবং আর্কের ১ মিনিট, ৩ সেকেন্ড। এর অনুপাত দাঁড়ায় ১:৩০.৯৩।

এটা খেয়াল রাখা দরকার, পাঠানির পর্যবেক্ষণ ছিল কোনো আধুনিক টেলিস্কোপ ছাড়াই। বাঁশের দূরবীন, জলের ওপর তেল-এর মতো তাঁর হাতে-গড়া ঘরোয়া যন্ত্রপাতি দিয়ে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পাওয়া হিসেবের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া দেখে বাঘা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও তাঁকে সেলাম না ঠুকে পারেন না।

(ক্রমশ)

আর্দ্রতার সাতকাহন

বিবেক সেন

স্কুলপাঠ্য বিজ্ঞানবইয়ের দ্রাব্য, দ্রাবক, দ্রবণ-এর খেই ধরে লেখক ঢুকে পড়েছেন আবহাওয়া ও শারীর বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্বে। সহজ উদাহরণে, সরল বর্ণনায় মনোরম হয়ে উঠেছে 'আপেক্ষিক আর্দ্রতা'।

গ্রীষ্মের ভরদুপুরে ঘেমে নেয়ে বাড়ি ফিরলেন। গৃহকর্ত্রী একটা গ্লাস ধরিয়ে দিলেন। স্বচ্ছ, কিন্তু চুমুক দিয়ে বুঝলেন সাদা জল নয়, নুন-চিনি ভেজান সরবত। একটু মিষ্টি, সামান্য নোনতা, আর অল্প টক স্বাদ। গরমে ক্লান্তি হরণ করার আদর্শ নিরাপদ পানীয়। যদি মনে হয় আরও একটু মিষ্টি হলে সুস্বাদু হত, তবে গ্লাসে আরো এক চামচ চিনি ঢালুন। দানাগুলো ডুবে যাবে গ্লাসের তলায়। এবার চামচ দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে থাকুন। ধীরে ধীরে দানাগুলো অদৃশ্য হতে থাকবে। অবশেষে গ্লাসের সরবত হয়ে যাবে আগের মতো স্বচ্ছ। চুমুক দিয়ে দেখুন সরবত আপনার পছন্দমতো মিষ্টি হয়েছে কিনা।

ভাবছেন তো, সরবত তৈরি করা শিখতে আবার প্রাইভেট টিউটর লাগে নাকি! না, সত্যিই লাগে না। তাহলে এবার বরং পরের পাঠটা শুরু করা যাক। শেষ করার পর ভেবে দেখবেন সাহায্যের প্রয়োজন ছিল কিনা। একটা বড় পাত্রে বেশি করে জল নিন। আস্তে আস্তে চিনি ঢালতে থাকুন ও নেড়ে নেড়ে সরবতের মতো স্বচ্ছ করে তুলুন। আবার চিনি ঢেলে আগের মতো জলে মেশাতে থাকুন। এক সময় দেখবেন, দানাগুলোকে আর জলে মেশানো যাচ্ছে না। এবার সরবতের পাত্রটাকে আস্তে আস্তে গরম করতে থাকুন ও সেই সঙ্গে নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না চিনি মেশানো জলটুকু আবার স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। পাত্রটিকে আরও বেশ কিছুটা গরম করুন ও চিনি মেশাতে থাকুন। পাত্রের জল যেমন যেমন বেশি গরম হবে তেমনি আরো বেশি চিনি দিয়ে স্বচ্ছ মিশ্রণ তৈরি করা যাবে।

এবার স্বচ্ছ মিশ্রণটিকে খুব আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে দিন। দেখা যাবে, অদৃশ্য চিনির দানাগুলো মিশ্রণ থেকে বেরিয়ে এসে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। তবে চিনিকে আর আগের চেহারায় ফিরে পাবেন না। দেখা যাবে একটা স্ফটিক (ক্রিস্টাল) দানার আকারে। মিশ্রণ যত ঠাণ্ডা হচ্ছে স্ফটিকটি ততই বড় হয়ে চলেছে। এটিকে আমরা আমাদের চিরপরিচিত মিছরি (ক্যান্ডি) বলে জানি।

এবার তৃতীয় পাঠে উপরের উদাহরণ দুটিকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় ব্যক্ত করব। কোনো তরলে কোনো একটি কঠিন পদার্থ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া না করে যদি এমনভাবে মিশে যায় যাতে কঠিন পদার্থটি তরলটিতে অদৃশ্য আকারে থাকে তবে সেই মিশ্রণটিকে সেই তরলে কঠিন পদার্থটির দ্রবণ (সলিউশন) বলা হয়। তরলটিকে দ্রাবক (সলভেন্ট) ও কঠিন পদার্থটিকে দ্রাব্য (সলিউট) বলা হয়। উপরে উল্লেখ করা সরবতটি জলে চিনির দ্রবণ। এখানে জল দ্রাবক ও চিনি দ্রাব্য। সরবতে চিনি আকার হারালেও চিনির গুণাবলী হারায় নি, জলও তার চরিত্র বদলায় নি। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় নি। রাসায়নিক বিক্রিয়াতে নতুন কোনো পদার্থের সৃষ্টি হয় যার চরিত্র মূল পদার্থগুলি থেকে আলাদা।

সরবতের উদাহরণ থেকে আমাদের আরও কিছু শেখার আছে। যেমন, ১) চিনির পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়ালে সেটা জলে মিশে স্বচ্ছ মিশ্রণে পরিণত হতে থাকে। ২) কিন্তু তার একটা সর্বোচ্চ মাত্রা আছে। সেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে চিনি আর জলে মিশে যাবে না। পাত্রের তলায় পড়ে থাকবে। এই অবস্থায় পৌঁছলে বলা হয়, মিশ্রণটি চিনি দ্বারা সম্পৃক্ত (স্যাচুরেটেড) হয়ে গেছে। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো

নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে দ্রাব্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ দ্রবীভূত করা হলে দ্রবণটি সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। দ্রবণটি এর বেশি দ্রাব্যকে ধরে রাখতে পারবে না। ৩) সম্পৃক্ত দ্রবণটির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিলে সেটি আবার অসম্পৃক্ত (আনস্যাচুরেটেড) হয়ে পড়ে। তাকে পুনরায় সম্পৃক্ত করতে হলে আরও কিছুটা দ্রাব্য এতে দ্রবীভূত করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায় বেশি তাপমাত্রায় দ্রবণকে সম্পৃক্ত করতে হলে দ্রাব্যের পরিমাণ বাড়াতে হবে। ৪) বিপরীতে, সম্পৃক্ত দ্রবণকে ঠাণ্ডা করলে অতিরিক্ত দ্রাব্য দ্রবণ থেকে বের হয়ে আসবে। কারণ কম তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত দ্রবণ কম পরিমাণ দ্রাব্য ধারণ করতে পারে।

তরলে কঠিন পদার্থের মিশ্রণের মতো আরও নানারকম মিশ্রণ হতে পারে— যেমন দুটো বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণ। আর্দ্রবায়ু এমনই একটি মিশ্রণ। জল বাষ্পীভূত হয়ে শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে মিশে বায়ুকে আর্দ্র করে। বায়ু ও জলীয় বাষ্প দুটোই বায়বীয় পদার্থ। সরবত ও আর্দ্র বায়ুর মধ্যে একটা বিরাট ফারাক হল সরবতের জল ও চিনি দুটোই আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য, চিনি কখন জলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর কখনও বা মিশ্রণ থেকে বেরিয়ে আসছে সেটা আমরা চোখে দেখে বুঝতে পারি। আর্দ্র বায়ুতে বায়ু এবং জলীয় বাষ্প দুটোই আমাদের চোখে অদৃশ্য। তাই সরবতের উদাহরণ দিয়ে দ্রবণ বা মিশ্রণের নিয়মগুলি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ উপরোক্ত নিয়ম চারটি আর্দ্র বায়ুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, অর্থাৎ তরল জলকে বাষ্পের আকারে বায়ুতে ধারণ করে রাখার ক্ষমতাটাও সীমাবদ্ধ— যেমন তরল জলে চিনির পরিমাণ। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যখন সর্বোচ্চ তখন তাকে আমরা সম্পৃক্ত বায়ু বলে থাকি। সম্পৃক্ত বায়ুতে জলীয় বাষ্পের এই পরিমাণ বায়ুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। উষ্ণ বায়ু বেশি পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করতে পারে, শীতল বায়ু কম। তাই সম্পৃক্ত বায়ুকে শীতল করলে ক্ষমতার অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প তরল জলের আকারে বেরিয়ে আসে।

আবহাওয়ার প্রাত্যহিক প্রতিবেদনে আবহাওয়া অফিস সেদিনের আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান জানিয়ে দিয়ে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় বায়ুতে জলীয় বাষ্পের যোগান (পরম আর্দ্রতা) একই থাকলেও সারাদিনের আপেক্ষিক আর্দ্রতা একরকম থাকে না। কারণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা রিলেটিভ হিউমিডিটি যে বায়ুর তাপমাত্রার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল সেটা আমরা আগেই জেনেছি।

আর্দ্র বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে খুবই কম, কিন্তু মেঘ, বজ্র-বিদ্যুৎ, ঝড় ও বৃষ্টির সৃষ্টিতে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাপ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, আর্দ্র বায়ু বলতে আমরা জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ুর কথাই বলছি তাতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যত সামান্যই হোক। সেই সামান্য পরিমাণ বাষ্পকে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করাটাই আর্দ্রতার পরিমাপ।

আর্দ্রতাকে চার রকম এককে প্রকাশ করা হয়ে থাকে— পরম আর্দ্রতা (অ্যাবসোলিউট হিউমিডিটি), সাপেক্ষ আর্দ্রতা (স্পেসিফিক হিউমিডিটি), মিশ্রণ অনুপাত (মিক্সিং রেশিও) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (রিলেটিভ হিউমিডিটি)। আয়তনের প্রতি ঘন এককে থাকা জলীয় বাষ্পের ওজনকে পরম আর্দ্রতা বলা হয়, প্রকাশ করা হয় গ্রা/মি^{3} এককে। প্রতি কেজি জলীয় বাষ্প মিশ্রিত বায়ুতে যত গ্রাম জলীয় বাষ্প আছে সেটি সাপেক্ষ আর্দ্রতা, আর প্রতি কেজি শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে যত গ্রাম জলীয় বাষ্প মিশে আছে সেটা মিশ্রণ অনুপাত। সাপেক্ষ আর্দ্রতা ও মিশ্রণ অনুপাত দুটিকেই গ্রা/কেজি এককে প্রকাশ করা হয়।

বায়ুমণ্ডলের কর্মকাণ্ড আলোচনায় সাপেক্ষ আর্দ্রতা ও মিশ্রণ অনুপাত সবচেয়ে বেশি উপযোগী। কিন্তু আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি পরিচিত আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা রিলেটিভ হিউমিডিটি, আমাদের একান্ত আপনজন। সংবাদপত্রে বা রেডিও-টিভিতে আবহাওয়ার খবর জানানোর সময় চলে আসে এর কথা। বায়ুকে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্পের সাপেক্ষে এই অনুপাতটি নির্ণয় করা হয়— প্রকাশ করা হয় শতকরা হারে। রিলেটিভ হিউমিডিটির গণিতকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলার জন্য উপরে বলা সরবতের উদাহরণটির সাহায্য নেওয়া যাক। এখানে জলীয় বাষ্পমিশ্রিত আর্দ্র বায়ুর সঙ্গে চিনি মিশ্রিত সরবতটি তুলনীয় এবং বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার সঙ্গে সরবতের মিষ্টত্ব ও বায়ুকে সম্পৃক্ত করার জন্য জলীয় বাষ্পের পরিমাণের সঙ্গে তুলনীয় সরবতটি সম্পৃক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় চিনির পরিমাণ। ১) ধরা যাক গ্লাসের সরবতটিকে সম্পৃক্ত করতে ১০ চামচ চিনি প্রয়োজন। কিন্তু গ্লাসে চিনি দেওয়া হয়েছে ২ চামচ। তাহলে মিষ্টত্বের অনুপাত হল ২/১০। যেহেতু অনুপাতটি শতকরা হারে প্রকাশ করা হয় তাই এই অনুপাতটি

১০০ দিয়ে গুণ করে সরবতের আপেক্ষিক মিষ্টত্ব দাঁড়াল শতকরা ২০ ভাগ।

অনুরূপভাবে বায়ুতে থাকা জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি সেই বায়ুকে সম্পৃক্ত করার মতো জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ১০ ভাগের দুই ভাগ হয় তবে সেই বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা দাঁড়ায় শতকরা ২০ ভাগ। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সম্পৃক্ত বায়ুতে দলীয় বাষ্পের অর্ধেক হলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে শতকরা ৫০ ভাগ; সমান সমান হওয়ার অর্থ বায়ুটি সম্পৃক্ত, তাই তখন আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান দাঁড়ায় শতকরা ১০০ ভাগ।

এবার স্মরণ করা যাক মিশ্রির উদাহরণটি। আমরা দেখেছি জল ও চিনির সম্পৃক্ত মিশ্রণের তাপমাত্রা বাড়ালে দ্রবণটিকে সম্পৃক্ত করতে হলে দ্রাব্যের (এখানে চিনির) পরিমাণ বাড়াতে হয়। মনে করা যাক ১০ চামচ চিনি দিয়ে মিশ্রণটিকে সম্পৃক্ত করে মিষ্টত্ব শতকরা ১০০ ভাগে আনা হয়েছিল। তাপমাত্রা বাড়াতে সেটিকে পুনরায় সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজন মোট ১৫ চামচ চিনির। কিন্তু মিশ্রণে আছে ১০ চামচ চিনি। তাই মিষ্টত্ব কমে দাঁড়াল শতকরা ৬৭ ভাগ। তেমনি আর্দ্র বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ না বাড়িয়ে তাপমাত্রা যদি বাড়ান হয় তখন আর্দ্রতারও শতকরা মান যাবে কমে। এটি আমাদের প্রতিদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা। আবহাওয়ার প্রাত্যহিক প্রতিবেদনে আবহাওয়া অফিস সেদিনের আপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান জানিয়ে দিয়ে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় বায়ুতে জলীয় বাষ্পের যোগান (পরম আর্দ্রতা) একই থাকলেও সারাদিনের আপেক্ষিক আর্দ্রতা একরকম থাকে না। কারণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা রিলেটিভ হিউমিডিটি যে বায়ুর তাপমাত্রার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল সেটা আমরা আগেই জেনেছি।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া না হলে একটা দিনে জলীয় বাষ্পের যোগানের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু বায়ুর তাপমাত্রা সকাল থেকে ক্রমে বাড়তেই থাকে। সকালে তাপমাত্রা থাকে সর্বনিম্ন, তাই আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান হয় সর্বোচ্চ। বেলা যত বাড়ে সেই সঙ্গে ততই বাড়তে থাকে বায়ুর তাপমাত্রা, আর কমতে থাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা। বেলা আড়াইটে থেকে তিনটে নাগাদ তাপমাত্রা হয় সর্বোচ্চ আর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হয় সর্বনিম্ন। সূর্য যখন পশ্চিম দিগন্তের দিকে ঢলতে থাকে তখন শুরু হয় তাপমাত্রার নিম্নমুখী যাত্রা তার আপেক্ষিক আর্দ্রতার বৃদ্ধির। সারা রাত্রি ধরে চলে এই বৃদ্ধি এবং এর সর্বোচ্চ মানে আবার পৌঁছয় পরদিন সূর্যোদয়ের পর।

কেবলমাত্র আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান দেখে বায়ুতে থাকা জলীয় বাষ্পের পরিমাণের সঠিক ধারণা করা যায় না— কখনও কখনও সেটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অপেক্ষিক আর্দ্রতার সর্বনিম্ন মান শীতকালে ও গ্রীষ্মের কোনও দুপুরে যদি সমান হয় তাহলে গ্রীষ্মের দুপুরে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যে বেশি হবে সেটা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট। এমন কি গ্রীষ্মে কিছুটা কম হলেও এই পরিমাণ বেশি হতে পারে।

> দুপুর গড়িয়ে বেলা যখন বিকেলের দিকে যায় দিনের তাপমাত্রা তখন সর্বোচ্চ— আর্দ্রতা সর্বনিম্ন। এমন সময় গাছে জল সিঞ্চনে আপনার পরিশ্রমের অনেকটাই বিফলে যাবে। কারণ আপনার দেওয়া জলের একটা বড় অংশ বাষ্পীভূত হয়ে মিশে যাবে বায়ুতে। আপনার প্রিয় গাছগুলি হবে বঞ্চিত।

বায়ুতে জলীয় বাষ্পের জোগান আসে প্রধানত সমুদ্র, নদী, হ্রদ ইত্যাদির উপরিভাগ থেকে জলের বাষ্পীভবনের ফলে। বায়ুতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা যত কম হবে তত দ্রুত হবে বাষ্পীভবন। জোগান যতক্ষণ চলতে থাকবে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ততই বাড়তে থাকবে। আর সেই সঙ্গে বাষ্পীভবনের মাত্রা ক্রমাগত কমবে। বায়ু সম্পৃক্ত হয়ে গেলে বাষ্পীভবন বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ তখন অতিরিক্ত বাষ্প তরল জলে পরিণত হয়ে সমুদ্র বা হ্রদে আবার ফিরে আসবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতার এই ধর্ম আমাদের প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে, এমনকি আমাদের শারীরিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে, যদিও আমরা সে সম্বন্ধে সচেতন নই।

ধরা যাক আপনার এখন অবসর জীবন, তবে বাগানের শখ আছে। কিছু প্রিয় ফুলের গাছ লাগিয়েছেন, কিছুটা জমিতে নিত্য প্রয়োজনীয় শাক-সবজি। দিনে এর পেছনে ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় করেন, কিছুটা সময় যায় গাছে গাছে জল সিঞ্চনে। এই জল আপনি দিয়ে থাকেন সকালের দিকে অথবা সন্ধ্যার পরে। কখনও দুপুরে বা বিকেলের দিকে নয়। কিন্তু কেন, সেটা হয়ত ভেবে দেখেন নি। এবার সেটা ভেবে দেখুন। সারাদিনে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কী ধরনের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে চলে, সেটা তো আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

দুপুর গড়িয়ে বেলা যখন বিকেলের দিকে যায় দিনের তাপমাত্রা তখন সর্বোচ্চ— আর্দ্রতা সর্বনিম্ন। এমন সময় গাছে জল সিঞ্চনে আপনার পরিশ্রমের অনেকটাই বিফলে যাবে। কারণ আপনার দেওয়া জলের একটা বড় অংশ বাষ্পীভূত হয়ে মিশে যাবে বায়ুতে। আপনার প্রিয় গাছগুলি হবে বঞ্চিত।

সব কৃষকের ভাগ্যে সেচের জল জোটে না। তাকে অগভীর নলকূপ বসিয়ে বিদ্যুৎ খরচ করে পাম্প চালিয়ে জলের ব্যবস্থা করতে হয়। দিনের তাপমাত্রা যখন সর্বোচ্চ, আর্দ্রতা সর্বনিম্ন, তখন জসসেচের চেষ্টা করলে তারও অবস্থা হবে আপনারই মতো। বিদ্যুতের খরচ বাড়বে, অথবা ক্ষেতের শস্য বঞ্চিত হবে সেচের জল থেকে।

ফ্রিজ থেকে বের করে আমরা এখন ঠাণ্ডা জল পান করি। পঞ্চাশ বছর আগেও মাত্র গুটিকয়েক ধনশালী পরিবারের পক্ষেই এই সৌখীনতা সম্ভব ছিল। আমজনতার জন্য ছিল মাটির কুঁজো। প্রকৃতির সহৃদয়তায় তারা নিখরচায় পেত শীতল জল। কুঁজোর অসংখ্য সূক বেরিয়ে আসা জলের বাষ্পীভবনের তাপ জোগান দিত কুঁজো, আর নিজে হয়ে পড়ত শীতল থেকে শীতলতর। দিনের তাপমাত্রা যত বাড়ত, আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমত, আর বাড়তে থাকত বাষ্পীভবনের হার। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা যত বাড়ত, কুঁজোর কাজের দক্ষতা ততই বেড়ে যেত। কিন্তু বর্ষাকালে তাপমাত্রা বেশি হলেও কুঁজো অকেজো হয়ে পড়ে। কারণ বর্ষাকালে আর্দ্রতার মান দিনভরই অনেকটা বেশি থাকে। তাই বাষ্পীভবনের হার কমে যায়। সান্ত্বনা এই যে বর্ষা ও শীতকালে ঠাণ্ডা জলের তেমন কিছু প্রয়োজন হয় না।

গ্রীষ্মে আর্দ্রতার কাপর্ণ্য কুঁজোর ঠাণ্ডা জলের জন্য আশীর্বাদ হলেও আমাদের দেহযন্ত্রের জন্য বিপদের কারণ হয়ে উঠতে পারে। কুঁজোর মতই আমাদের দেহ অসংখ্য রোমকূপের মাধ্যমে দেহ থেকে জল ত্বকের ওপরে পাঠিয়ে দেয়। সেই জল বাষ্পীভূত হয়ে দেহকে শীতল করে ও অসহ্য গরমকে কিছুটা সহনীয় করে তোলে। কিন্তু এটি মাত্রাতিরিক্ত হলে আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ ডেকে আনতে পারে। কারণটা হল জলের সঙ্গে সঙ্গে দেহের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু খনিজ পদার্থও (মিনারেল) বেরিয়ে আসে। শরীরে এই খনিজ পদার্থ বেশি কমে গেলে মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতে পারে, হতে পারে আরও নানারকম অসুবিধে— যেমন মাথাব্যথা, বমির ভাব ইত্যাদি। পশ্চিম ভারতে গ্রীষ্মে বায়ুতে আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম তো থাকেই সেই সঙ্গে বায়ুর বেগও থাকে বেশি (লু প্রবাহ)। বায়ুর বেগ বেশি হলে বাষ্পীভবনের হার বেড়ে যায়। তাই বিপদের সম্ভাবনাও বেশি। ভারতের এই অঞ্চলে হয়ত সেইজন্য লস্যি জাতীয় পানীয়ের প্রচলন বেশি। জলের সঙ্গে সঙ্গে এটা কিছু খনিজ পদার্থেরও জোগান দেয়।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা মাত্রাতিরিক্ত কম হলে মানুষের যেমন বিপদের কারণ হয়ে ওঠে, তেমনি আবার মাত্রাতিরিক্ত বেশি হলেও অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। রোমকূপের মাধ্যমে দেহের জল বেরিয়ে এসে বাষ্পীভূত হলে আমাদের ত্বকের তাপমাত্রা (স্কিন টেম্পারেচার) বায়ুর তাপমাত্রা থেকে কম বলে মনে হয়— আমাদের স্বস্তির কারণ হয়। কিন্তু আর্দ্রতা খুব বেশি হলে অল্প বাষ্পীভবনের পরেই আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ১০০ ভাগে পৌঁছে যায়— বন্ধ হয়ে যায় বাষ্পীভবন। ফলে দেহ থেকে বেরিয়ে আসা জল ত্বকের উপরে সেটা বিন্দু বিন্দু ঘামের আকারে জমতে থাকে। ত্বকের তাপমাত্রা মনে হয় বায়ুর তাপমাত্রা থেকে বেশি, বাড়তে থাকে অস্বস্তি। একটি গাণিতিক সূত্রে বায়ুর তাপমাত্রা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও বায়ুর বেগের মান বসিয়ে একটা সূচক হিসেবে করা হয়। এই সূচকের মান একটা নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আমরা অস্বস্তি বোধ করি। বায়ুর বেগকেও এই সূত্রে নেওয়া হয়েছে কারণ বায়ুর বেগ বেশি হলে বাষ্পীভবন দ্রুত হয়— অত্যধিক আর্দ্রতার প্রভাব করে কিছু পরিমাণে প্রশমিত।

চাষবাসের জন্য আমাদের বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়। প্রকৃতি সদয় হলে হয়ত দিন দুই বৃষ্টি হল, কিন্তু দেখা গেল সাত দিন চলে গেল বৃষ্টির আর দেখা নেই। সেই সময় বৃষ্টি না হলেও আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান যদি বেশি থাকে তাহলে চাষী অনেকটা স্বস্তি পাবে, বাষ্পীভবন কম হওয়ার দরুন চাষের জমি শোষিত বৃষ্টির জল বেশি দিন ধরে রাখতে পারবে। শস্যে পুষ্টির জোগান থাকবে অব্যাহত।

বৃষ্টির জল মাটির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে ভূগর্ভে প্রবেশ করে ভূগর্ভস্থ জলস্তরকে পুষ্ট করে। কিন্তু বৃষ্টির পর বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি দ্রুত কমে যায় তবে বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুতে মিশে যাওয়ার দরুন বৃষ্টির জল ভূগর্ভে প্রবেশ করার সময় পায় না। ভূগর্ভের জলস্তর প্রকৃতির দয়া থেকে হয় বঞ্চিত।

আবহাওয়া আমাদের চোখে ধরা দেয় মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, বজ্র-বিদ্যুৎ, কুয়াশা ইত্যাদি নানারকম রূপ ধরে। এদের সৃষ্টিতে জলীয় বাষ্পের জোগান একটি প্রধান উপাদান, সেটা অনস্বীকার্য। তবে বায়ুমণ্ডলে বিশেষ বিশেষ অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে শুধুমাত্র জলীয় বাষ্প মেঘ বৃষ্টি ইত্যাদি রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। তাই সে আলোচনা এখন তোলা থাক।

সুন্দরবনে মানুষ
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

আইলার তাণ্ডবের ৫ বছর কেটে গেছে, কিন্তু শুনতে পাই ক্ষতিগ্রস্ত হতভাগ্যদের দুর্দশা তেমন কিছুই লাঘব হয় নি, অনেক পরিকল্পনা হয়েছে, কার্যক্ষেত্রে কিছুই প্রায় এগোয় নি, যেটুকু হয়েছে তাতে লাভ হয়েছে শুধু সে সব কাজের ঠিকাদারদের, যাদের জন্য তাদের কষ্টের সুরাহা হয় নি। জীবিকার খোঁজে দলে দলে পুরুষ স্ত্রী-পুত্র পেছনে রেখে দেশান্তরী হচ্ছেন, সমৃদ্ধ নগরগুলোর (কলকাতায় নয়) শ্রমজীবী বস্তিগুলোতে ভিড় বাড়াচ্ছেন।

শুধু কালানুক্রম বজায় রাখার জন্যই এ লেখা অতীত থেকে শুরু হচ্ছে তা নয়। যদিও এর অভিমুখ ভবিষ্যৎ তবুও এ লেখার মূল প্রতিপাদ্য উপস্থাপনার জন্য অতীত দিগ্‌দর্শক হতে পারে। বলে রাখা ভাল, আমি ইতিহাসের ছাত্র নই, অতীত সম্বন্ধীয় তথ্য (আর বর্তমান পরিস্থিতি) বিভিন্ন সূত্র থেকে আহরিত। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বক্তব্যটি অবশ্য আমার নিজস্ব অনুভূতি, তার ভিত্তি জীবিকার সূত্রে সুন্দরবনকে একসময়ে যেটুকু জেনেছিলাম। তবে দেখে আশ্বস্ত হচ্ছি, বহু বিদগ্ধ গবেষণার প্রতিবেদনে আমার বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে।

অতীত

কিছু বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক নিদর্শনে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এ অঞ্চল অশোকের (খ্রি. পূ. ২৭৩-২৩২) সময়েও জনাকীর্ণ ছিল। যদিও এ যাবৎ যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে করে এই ব-দ্বীপ অঞ্চলের সভ্যতার একটা সামগ্রিক ও ধারাবাহিক বিবরণ তৈরি করা যায় না। তবে সে ধারাবাহিকতা ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সুন্দরবন নামটার উৎপত্তি সাম্প্রতিক, এসেছে এ অঞ্চলের সুন্দরী হেরিটিয়েরা ফোমেস (Heritiera fomes)

গাছের প্রাচুর্য থেকে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙয়ের (যিনি সপ্তম খ্রিষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন) বৃত্তান্ত, এ সবেই সুন্দরবন অঞ্চলের অসংখ্য উল্লেখ আছে। সপ্তম শতাব্দীতে এই অঞ্চল সম্ভবত সমতট ভূমির অন্তর্গত ছিল। হিউয়েন সাঙ একে সমুদ্র সন্নিকটের একটি শস্যসমৃদ্ধ নীচু জমি বলে বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগের রচনায় বারংবার এ অঞ্চলকে 'বাটি' বা কথ্যভাষা আর লোকসংগীতে 'ভাটি' বলা হচ্ছে। আর ভাগীরথীর পূব পাড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলকে 'বাঙ্গালা' আর অধিবাসীদের 'বাঙাল' বলা হত। লোকসঙ্গীতের একটি পঙ্‌ক্তি ছিল 'ভাটি হইতে আইলা বাঙ্গাল, লম্বা লম্বা দাড়ি।' আবুল ফজল তাঁর আকবরনামাতেও এই উপকূলভাগকে 'ভাটি' বলে উল্লেখ করেছেন। নামটি নাবাল জোয়ার ভাঁটার জমি বোঝায়, অঞ্চলটি যে ঘন অরণ্যে ঢাকা ছিল বোঝায় না। এই অঞ্চলটিই পরে 'সুন্দরবন' নাম পেয়ে যায়।

বর্তমানে জনশূন্য সুন্দরবনের অনেক অঞ্চলে যে মধ্যযুগে চাষবাস হত নীহাররঞ্জন রায় তার যথেষ্ট প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের গৌরব প্রতাপাদিত্যর পিতা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলার নবাবের কাছ থেকে বর্তমান সুন্দরবনের একটি অঞ্চল ইজারা নিয়ে 'যশোহরা' নামে একটি 'রাজ্য' পত্তন করেন (যা থেকে বর্তমান যশোর হিসাবে নামের উৎপত্তি)। ইংরেজ পরিব্রাজক ও বণিক র‍্যালফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch 1550-1611), যিনি দেশের এই অংশ ১৫৮৬ খিষ্টাব্দে ঘুরেছেন তিনি এই অঞ্চলকে উর্বর বলেছেন এবং সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস সহ্য করার মতো শক্তপোক্ত অট্টালিকা এখানে দেখেছেন।

এটাও সুপ্রতিষ্ঠিত যে পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে কোনো এক সময় থেকে বাংলার উপকূলভাগ পরিত্যক্ত হতে শুরু হয় এবং ক্রমে জঙ্গলে ঢেকে যায়। কারণটা রাজনৈতিক না প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিকদের কাছে স্পষ্ট নয়। নানা সম্ভাবনার কথা বলা হয়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (১৫৮৪-র একটি ভয়াবহ বন্যা), গঙ্গার মূল স্রোত ভাগীরথী থেকে পদ্মায় সরে যাওয়ায় এ অঞ্চলে পেয় জলের অভাবে জনজীবন দুঃসহ হয়ে যাওয়া, পর্তুগিজ ও মগ জলদস্যুদের হামলা, ইত্যাদি।

তবে আমার কাছে সবথেকে যুক্তিগ্রাহ্য, ও তাই বিশ্বাসযোগ্য, মনে হয় হেনরি পিডিংটনের (১৭৯৭-১৮৫৮) প্রস্তাব।

হেনরি পিডিংটনের সুন্দরবন

এক ভারতীয় লেখকের একটি জনপ্রিয় ইংরেজি উপন্যাসের কল্যাণে পিডিংটনের নাম এখন অনেকেই জানেন। সামুদ্রিক ঝড়ে বিধ্বস্ত একটি জাহাজের ভাগ্যক্রমে উদ্ধার পাওয়া এই অধিনায়ক পরবর্তী জীবনে কলকাতায় থিতু হয়ে নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সামুদ্রিক ঝড় সম্বন্ধে ধারাবাহিক গবেষণা করে তিনি এর বিধ্বংসী রূপ সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করেছেন। 'সাইক্লোন' নামটিও তাঁর উদ্ভাবন। কলকাতা বন্দরের নাব্যতার ক্রমাবনতির ফলে বাণিজ্যতরীর যাতায়াতে অসুবিধায় উদ্বিগ্ন হয়ে তৎকালীন সরকার ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটি বিকল্প বন্দর পত্তনের পরিকল্পনা করেন ও মাতলা নদীর ওপর একটি জায়গা নির্বাচন করেন। সে স্থানটির যোগ্যতা খতিয়ে দেখার জন্য ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের তিনজনের মধ্যে একজন ছিলেন পিডিংটন। পিডিংটনের সুচিন্তিত মত উপেক্ষা করে বর্তমান ক্যানিংয়ে বন্দর প্রতিষ্ঠিত হল এবং কয়েক বছর বাদেই ধ্বংস ও পরিত্যক্ত হল এক জলোচ্ছ্বাসের অভিঘাতে। উপন্যাসে পিডিংটন এসেছেন এই ঘটনার বর্ণনাতেই, কিছু কল্পনায় জারিত হয়ে। সরকারকে এই নির্বুদ্ধিতা থেকে নিরস্ত করতে তৎকালীন শাসকপ্রধানকে তিনি সরাসরি একটি চিঠি লিখেছিলেন, পরবর্তী সব উদ্ধৃতি তা থেকে। সে চিঠিটার শিরোনাম : 'সুন্দরবনে সামুদ্রিক ঝড়ের জলোচ্ছ্বাস প্রসঙ্গে।' পিডিংটন সে চিঠি আরম্ভই করেছেন এভাবে: 'এটা কম উল্লেখযোগ্য নয় যে বাংলা তথা ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপে যোগাযোগের প্রাচীনতম রচনা, ডি. ব্যারোজ-এর 'এশিয়া'য় সুন্দরবনকে একটি জনবসতি অঞ্চল বলে বর্ণনা করা হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে, ১৫১০-১৫২০ খ্রিষ্টাব্দ, বা প্রায় ৩৫০ বছর আগে (রচনাকাল ১৮৫৩), আর এ সবের সঙ্গে একটি মানচিত্র রয়েছে যাতে বিভিন্ন শহর চিহ্নিত করা আছে।'

ওঁদের বর্ণনা যা তিনি অনুবাদ করে দিয়েছেন তাতে রয়েছে : 'বাংলা রাজ্যের দক্ষিণের সমুদ্রোপকূল অঞ্চল, যার পশ্চিমে 'সাতিগাম' (সাতগাঁও) আর পূবে 'চাটিগাম' (চট্টগ্রাম), গঙ্গার দুটি বাহু দিয়ে তৈরি করেছে গ্রীক অক্ষর

‘ডেল্টা’, যেরকম হয় সব বড় নদীর ক্ষেত্রে যা একাধিক মুখ দিয়ে সাগরে প্রবেশ করে। দুটি বাহুর মধ্যেকার স্থলভূমি বিভিন্ন দ্বীপ বা চড়ায় ভাগ হয়ে থাকে, যেগুলো আবার ভাগ আর তস্য ভাগ হয়ে যায় গঙ্গার, বা যে দুটি বড় নদী তার সঙ্গে মিশেছে, তার জলে।”

এরপরে রয়েছে ব্যবসার কারণে তাদের যাত্রাপথের বিভিন্ন দ্বীপের নাম : যথা ত্রাণক্ষেত্র, গুয়াচালান, বিদনী, মূলাডাঙ্গা, সন্দীপ, সোনাগাঁও ইত্যাদি।

পিডিংটন লিখেছেন: ‘সুন্দরবন প্রাচীনকালে একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল তার বহু প্রত্ন নিদর্শন রয়েছে। এমনকি ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতেও যে এখানে বহু সম্পন্ন জনপদ ছিল তা পর্তুগীজ নাবিকদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। দক্ষিণ বাংলার ব-দ্বীপের পশ্চিমপ্রান্তে বাণিজ্যনগর সাতগাঁও ও পূর্বপ্রান্তে চাটিগাঁও ও এ দুটির মধ্যে সুন্দরবনের অন্তঃস্থল দিয়ে যাত্রাপথের দুপাশের মানুষের জীবনযাত্রার বাস্তব ছবিও তাঁরা বর্ণনা করেছেন।

‘এই বিস্তীর্ণ জনবহুল অঞ্চল কালে কালে কী করে একটি নির্জন অরণ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যাতে অষ্টাদশ শতকে নতুন করে বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হল সে প্রশ্ন থেকে যায়। এর কারণ হিসেবে পর্তুগিজ, মগ, মালয়দেশীয়, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের এমনকি স্বদেশী জলদস্যুদের লুটপাট ও দাসবৃত্তির জন্য মানুষ ধরে নিয়ে যাওয়াকে দায়ী করা হয় (যেমনভাবে আফ্রিকার উপকূলে করত দাস ব্যবসায়ীরা)। পর্তুগিজ ঐতিহাসিকদের লেখায় এই পরিস্থিতির সমর্থনও পাওয়া যায়।”

পিডিংটনের মতে, ‘এই কারণটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিলেও এটি এ অঞ্চলের এত অভ্যন্তর পর্যন্ত পুরো জনশূন্য হয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত কারণ মনে হয় না। তৎকালীন সুলতানেরা উপকূলভাগ আর ছোটো খাটো গ্রামকে জলদস্যুদের হাতে ছেড়ে দিলেও অভ্যন্তরভাগ আর গুরুত্বপূর্ণ শহর রক্ষা করার মত শক্তিশালী নিশ্চয়ই ছিলেন। আর তাহলে আশেপাশের জমিদারেরা আর রায়তেরা ক্রমে ক্রমে এই উর্বর জমিতে বসতি গড়ে তুলতেন। তাই প্রশ্ন ওঠে তবে কি কোনো প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক কারণ সুন্দরবনকে শুধু যে জনশূন্য করেছিল, তাই নয় জনবসতি ফিরে আসতেও দেয় নি?

‘আমার মনে হয়, এ কারণটা মাটি বসে যাওয়ার অতিপরিচিত ভূতাত্ত্বিক ঘটনা, যার ফলে জমি নীচু হয়ে গিয়ে নিরন্তর এবং বিধ্বংসী প্লাবনের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। এর স্বপক্ষে আমি অচিরেই প্রমাণ দেব।—

‘ভূতাত্ত্বিকেরা অবগত আছেন যে, এই ক্রমে ক্রমে বা অকস্মাৎ অভ্যুত্থান এবং বিস্তীর্ণ বা স্বল্প ব্যপ্তির অঞ্চলের বসে যাওয়ার এই যে প্রক্রিয়া পৃথিবী জুড়ে আদিকাল থেকে চলে আসছে তার থেকে স্বাভাবিক বা সদাসক্রিয় আর কিছু নেই। অন্য পাঠকদের জন্য এটা বলাই যথেষ্ট হবে যে পৃথিবীর সব অংশে তা সে উপকূলে হোক বা অভ্যন্তরভাগে, সবচেয়ে কঠিন গ্র্যানাইট শিলা বা অত্যন্ত নরম ও নবীন পাললিক শিলায় শুধু যে এ প্রক্রিয়ার চিহ্ন এবং স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তা নয়, বহু জায়গায় এই ওঠাপড়া মাপা হয়েছে।... আমাদের সময়েই কচ্ছর রানে একটা পুরো অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে চলে গিয়েছে।

‘কখনও এটা এত ধীর যে একদম বোঝাই যায় না, আবার কোনো কোনো জায়গায় এটা কাঁপা কাঁপা, প্রথমে ওঠা তারপর পড়া, আবার ওঠা। আগ্নেয়গিরির দেশ বা তাদের আশেপাশের দেশগুলোর অন্তত বর্তমানে এবং আমাদের জ্ঞানত, এ প্রবণতা বেশি। এ প্রক্রিয়া যে পাহাড় থেকে গঙ্গার ব-দ্বীপে স্যান্ডহেডস-এর বেলাভূমি পর্যন্ত ঘটেছে, তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে বিশেষ করে ব-দ্বীপের নিচের দিকে...।’

এরপর পিডিংটন চট্টগ্রাম ও তাঁর আশেপাশের কিছু ঘুমন্ত অগ্নিয়গিরির বর্ণনা দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করার চেষ্টা করেছেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে জমির ওঠাপড়ার উদাহরণ দিয়েছেন। নানা উদাহরণের মধ্যে একটি ছিল :

‘১৮১৯ সালে সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপে একটি বিধ্বংসী ভূমিকম্প ভূজ শহরকে একটা ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে দিয়েছিল, যদিও সাধারণভাবে সমুদ্র-দূরবর্তী অঞ্চলের চেহারার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু সিন্ধু নদীর পূবদিকের শাখা যাতে এর আগে ভাঁটার সময়ে মাত্র এক ফুট জল থাকায় হেঁটেই পারাপার করা যেত, সেটা ভাঁটাতেই ১৮ ফুট গভীর হয়ে গেল। সিন্ধ্রি গ্রাম আর তার দুর্গ এতটাই বসে গেল যে দুর্গের একটা গম্বুজ ছাড়া আর সব জলের তলায় চলে গেল।

এভাবে দু হাজারেরও বেশি বর্গমাইল একটি অঞ্চল

উপহ্রদে পরিণত হল।... কয়েক বছর আগেই যা ছিল জমি, হয়ে গেল পতিত জলাভূমি, যার উত্তরে রইল শুধু এক চিলতে জমি, 'আল্লা বাঁধে'র নিদর্শন হিসেবে।'

'আনুমানিক ৫০ মাইল লম্বা আর কোনো কোনো জায়গায় ১৬ মাইল চওড়া এই দীর্ঘ ঢিবিটিকে ভূমিকম্প এবং প্লাবন একটা নিখুঁত সমতলভূমি থেকে ঠেলে তুলে দিয়েছিল। অতএব আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে যে অবনমন সুন্দরবনকে পর্যুদস্ত করেছে তারই 'আল্লা বাঁধ'-এর ওপর কলকাতা দাঁড়িয়ে এবং হয়তো বা সে সময় থেকে উঁচু হয়েই চলেছে।' তিনি এ প্রসঙ্গ শেষ করেছেন তাঁর একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে।

'১৮৩৭ সালে হুগলির অপর পারে গৌরীপুরে একটা গভীর পুকুর খোঁড়ার সময় ২৫/৩০ ফুট গভীরে পাওয়া গিয়েছিল মিষ্টি জলের প্রাণীর খোলসের মধ্যে সুন্দরী কাঠের তৈরি একটি অসমাপ্ত দেশীয় চিনির কলের চোঙা, স্যাঁতসেতে পরিবেশে খানিকটা বদলেছে কিন্তু বেশ চেনা যাচ্ছে। কলকাতা আর সুন্দরবন কোথায় ছিল যখন হুগলি নদীতে ৩০ ফুট পলি জমা হচ্ছিল? তাদের বর্তমান উচ্চতার ৪০ ফুট নীচে আর তারপর ২০ ফুট উঁচুতে আমরা যা খুশি ভাবতে পারি, অথবা হয়তো হুগলি ও কলকাতা ধীরে ধীরে উঠেছে, আর সে সময় সুন্দরবন নেমে গেছে।' (এই প্রক্রিয়ার ক্ষীণ রেশ এখনও বহমান: একটি গবেষণায় প্রকাশ ডায়মন্ডহারবারের জমি এখনও বছরে চার মিলিমিটার হারে বসে যাচ্ছে।)

পিডিংটনের সিদ্ধান্ত, এই অবনমনের ফলেই সুন্দরবনে জলোচ্ছ্বাসের প্রকোপ এত বেড়ে যায় যে মনুষ্যবসতি অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বর্তমান

এরপর তিনি এ অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড়বাহিত জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবের বিভিন্ন উদাহরণ বর্ণনা করেছেন। তিনটির উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে :

(১) ১৭৩৭-এর ঝড়ের জলোচ্ছ্বাসে কলকাতা বন্দরে ৫০০ টনের দুটো ইংরেজ জাহাজ নদী থেকে ১২০০ ফুট ভেতরের একটা গ্রামে গিয়ে পড়েছিল। ৬০ টনের ছোট ছোট জাহাজগুলো উঁচু উঁচু গাছের মাথা ডিঙিয়ে ৬ মাইল ভেতরে গিয়ে পড়েছিল। জল উঠেছিল স্বাভাবিকের থেকে ৪০ ফুট উঁচু।

(২) ১৮৩৩ সালের একটি সাইক্লোনের জলোচ্ছ্বাসে সাগর দ্বীপের তখনকার পুরো জনসংখ্যা, প্রায় চার হাজার (তার মধ্যে কিছু ইউরোপীয়), নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সাগরে ও ডায়মন্ডহারবারে নোঙর করা জাহাজগুলো পশ্চিম পাড়ের ধানক্ষেত আর জলা জমিতে গিয়ে পড়েছিল। একটা জাহাজের নৌকো খেজুরিতে গাছপালা ডিঙিয়ে এক কিলোমিটারেরও বেশি ভেতরে গিয়ে পড়েছিল।

(৩) ১৮৫২ সালের সাইক্লোনের জলোচ্ছ্বাসে একটি স্টিমার ঘন জঙ্গল টপকে প্রায় আধমাইল ভেতরে গিয়ে পড়েছিল। স্টিমারের সঙ্গে ছিল একটা বজরা, সেটা দড়ি ছিঁড়ে স্টিমারের ৬০০ ফুট দূরে গিয়ে পড়েছিল, দেখা গেল একটা গাছের গুঁড়ি তার মেঝে ফুঁড়ে উঠেছে।

পিডিংটন পরবর্তী সময়ে ১৮৬৪ সালের ঝড়ে কলকাতায় জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে: 'এর সঙ্গে ছিল... একটা জলোচ্ছ্বাস যা নদীর দুপারে ৮ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, পুরো গ্রামকে গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, কোনো কোনো জায়গায় জল ৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়েছিল...।'

কলকাতা বন্দরে ঝড়ের তাণ্ডবের বর্ণনাও বীভৎস : 'সেই ভয়ঙ্কর দিনের শুরুতে (নদীতে) যেখানে দুশোরও বেশি জলযান চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, দিনের শেষে সেখানে একটিমাত্র জাহাজ নোঙরে আটকে ছিল...।'

১৯৪২ সালের একটি সামুদ্রিক ঝড় মেদিনীপুর উপকূলে কাঁথি ও তমলুকে আছড়ে পড়েছিল। এর জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ যুদ্ধকালীন গোপনীয়তার কারণে সরকারিভাবে বিশেষ কিছুই নেই। তবু যেটুকু পাওয়া গেছে তা সংক্ষেপে এরকম: '২৩০০ বর্গমাইল অঞ্চলের ৭৪০০ গ্রাম পুরোপুরি বা আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছিল, ৯০০ বর্গমাইলে ১৬০০ গ্রাম জলে ডুবে গিয়েছিল। কাঁথি ও তমলুকের ৭৮৬টি গ্রামের কোনো চিহ্ন ছিল না। ... ১৮৮, ০০০ দুগ্ধবতী গরু জলে ডুবে গিয়েছিল। নোনা জলে সব জলাশয় দূষিত হয়ে মানুষের খাওয়ার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল...।'

ঝড়ের ১১ দিন পর বাংলা সরকারের ত্রাণ অধিকর্তা সরেজমিনে তদন্তের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে

দেখেছিলেন। তাঁর প্রতিবেদনে ছিল: 'সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে আমি খুব অল্প সংখ্যক শিশু দেখতে পেলাম, শুনলাম অধিকাংশ জলে ডুবে মারা গেছে...। পুরো উপকূল অঞ্চলে আমি একটিও জীবিত গবাদি পশু দেখতে পাই নি।

'যে ধ্বংস আমি প্রত্যক্ষ করলাম, তা বর্ণনার অতীত। গ্রামের পর গ্রামে, একদা জনবহুল, জনবসতির কোনো চিহ্ন ছিল না।'

যার উল্লেখ দিয়ে এ রচনা শুরু সেই আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২২ লক্ষ।

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় পাই

'... মাঠে নেমে দেখি ৪-৫ ফুট উঁচু ঢেউ ধেয়ে আসছে মাঠ দিয়ে।...' নদীতে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ৮ মিটার। সর্বোচ্চ ৫ মিটার উঁচু বাঁধের সাধ্য কি সেই ধাক্কার সামনে রুখে দাঁড়ায়! ...৪০০ কিমি বাঁধ উৎখাত হয়েছে, না হলে হয়েছে ছিরিছাঁদহীন মাটির ঢিবি। সরকারি হিসেবে প্রাণহানি ৭০, নিখোঁজ আট হাজারের বেশি।

মনে রাখতে হবে, সাইক্লোনের মধ্যে আইলা ছিল দুর্বলদের একটি আর এ পশ্চিমবাংলাকে পাশ কাটিয়ে ডাঙায় উঠেছিল বাংলাদেশে। তবু এর ল্যাজের ঝাপটায় আমাদের যে হাল হয়েছে তা পাঁচ বছর বাদেও আমরা সামলে উঠতে পারি নি। পিডিংটনের প্রতিপাদ্যর ভয়াবহ, সবচেয়ে জোরালো, প্রমাণ অবশ্য বিগত শতকের সত্তরের দশক থেকে পরপর কয়েকটি জলোচ্ছ্বাসে প্রতিবেশী বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে প্রতিবার লক্ষাধিক লোকক্ষয়।

ভবিষ্যৎ

অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে অতীতকে অবজ্ঞা করে শুধু বর্তমান লাভের আশায় একদল অভাবী মানুষকে এক দুর্বিষহ ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দিয়েছিল কিছু অর্থগৃধ্নু মানুষ। তৎকালীন বাংলার নবাবের কাছ থেকে দক্ষিণবঙ্গ ইজারা নিয়ে বিদেশী বণিক কোম্পানি অব্যবহার্য জঙ্গলাকীর্ণ দ্বীপগুলিকে ১৭৭০ সালে দেশী জমিদারদের কাছে ক্রমে ক্রমে বিক্রি করা শুরু করে দিল। এককালে সমৃদ্ধ জনপদ কী করে ক্রমে জনশূন্য হয়ে গিয়ে ক্রমে ক্রমে ঘন অরণ্যের গ্রাসে চলে গেল যে বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন তারা মনে করে নি। তাদের একমাত্র লক্ষ ছিল যথাসম্ভব রাজস্ব বৃদ্ধি।

এদের পৈশাচিক লোভের একটি উদাহরণ পিডিংটনের লেখা চিঠিতেই রয়েছে, যদিও তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তাঁর মূল বক্তব্য, অর্থাৎ বর্তমান সুন্দরবনে এককালে সমৃদ্ধ জনপদ ছিল এবং সে অঞ্চল জনশূন্য এবং পরিত্যক্ত হয়ে যাবার কারণ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের বিধ্বংসী প্রচণ্ডতা। অরণ্য কবলিত বিশাল দ্বীপ সাগরকে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য তৎকালীন বিদেশী শাসকেরা ১৮২৩ সালে একটি কোম্পনি গঠন করেন সেখানে 'বন কেটে বসত' তৈরি করতে। এই কাজে যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা সমুদ্র সংলগ্ন ওই দ্বীপেও সর্বত্র প্রাচীন জনবসতির অকাট্য নিদর্শন পেয়েছেন। এ কাজ করার সময় একটি অদ্ভুত আবিষ্কার হয়। সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টন বহনক্ষম একটি জাহাজের মূল মাস্তুল। তার কিছু আড়কাঠি নিয়ে ডেকের কাছ থেকে ভেঙে গিয়ে দ্বীপের বেশ ভেতরে, সমুদ্র বা খাড়ি থেকে তিন-চার মাইল দূরে, জঙ্গলের মধ্যে বেশ সংরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। তাকে ঘিরে কুড়ি থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু সব গাছ, নিঃসন্দেহে কোনো প্লাবন তাকে ওইসব গাছের ওপর দিয়ে বয়ে নিয়ে এসেছে, কারণ নীচের ওই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ১০০ ফুট বয়ে নিয়ে যাওয়াও অসম্ভব। বেশি কিছু বছর আগে নয় কারণ তাহলে উইপোকা একে খেয়ে নিত। পরিচালকরা এই সত্যটি বিশেষ আদেশবলে কঠোরভাবে গোপন রেখেছিল কারণ নইলে কোম্পানিতে বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহ হত। এই শোচনীয় ফাটকাবাজি শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হল ১৮৩৩ সালের এক প্রচণ্ড সাইক্লোনের জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ৪০০০ শ্রমিক আর কিছু ইউরোপীয় তত্ত্বাবধায়ক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর। কারণ অবশ্য তখনও গোপন রাখা হয়েছিল।

প্রথমে অরণ্য সম্পদ বিক্রি ও পরে সেই নির্বৃক্ষ ভূমিতে ফসল ফলিয়ে প্রচুর অর্থাগম হতে লাগল, দ্বীপের পর দ্বীপে এভাবে চাষ হতে লাগল। জোয়ারে ডুবে যাওয়া এই দ্বীপগুলোর মধ্যে যেগুলো অপেক্ষাকৃত বড় সেগুলোকে মনুষ্য বাসোপযোগী করার জন্য তাদের চারপাশে বাঁধ দেওয়া হল। এসব শ্রমসাধ্য কাজের জন্য কর্মঠ অথচ কর্মহীন লোকের অভাব হয় নি সেকালেও। কিছু কিছু প্রলোভনও ক্ষেত্রবিশেষে ছিল।

মাতলা-বিদ্যাধরীর বদ্বীপগুলো থেকে আরম্ভ হয়ে জনবসতি ধীরে ধীরে দক্ষিণে ছড়াতে লাগল। কয়েক দশকের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বনাঞ্চলের বিরাট অংশ নির্বৃক্ষ হয়ে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ অরণ্য সম্পদ থেকে আহরিত রাজস্বও কমে আসছিল। অবশেষে শতাব্দীব্যাপী নির্বিচারে ধ্বংসের পর শাসকরা সংরক্ষণের ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করলেন। ১৮৭৪-৭৫ সালে তখনও অবিক্রিত দ্বীপগুলোর বনাঞ্চলকে সংরক্ষিত ঘোষণা করলেন। তা সত্ত্বেও মনুষ্য বসতির দ্বীপগুলোতে জনসংখ্যা বাড়তে ও অরণ্য কমতে লাগল। ১৮৭৩ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে এসব দ্বীপের অধিকাংশ গাছ নিশ্চিহ্ন করে মানুষ এসে বসল। সুন্দরবনের ৫২টি দ্বীপের জনসংখ্যা দাঁড়াল ৪৫ লক্ষ। আর এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে শুধু গ্রাসাচ্ছদনের জন্যই এমন সব জীবিকা গ্রহণ করতে হল যেগুলো পরিবেশের শত্রু।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র দু-এক মিটার উঁচু এই দ্বীপগুলোর অস্তিত্ব এতেই বিপন্ন হয়ে গিয়েছে। কারণ বাঁধগুলো আছে বলে কিন্তু ভূমিক্ষয় থেমে নেই। নদীর পাড়ের আর সমুদ্রের তীরের বিবর্তন অবিশ্রাম চলতে থাকে। ছোট থেকে বড় নানা মাপের ঢেউ, জোয়ার-ভাঁটা চক্র, আর (সমুদ্র) স্রোত নিরন্তর এ কাজে লিপ্ত। ঋতুতে ঋতুতে এগুলোর আবার প্রচুর পরিবর্তন হয়। সামুদ্রিক ঝড় আর তার জলোচ্ছ্বাসও এর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। দ্বীপগুলোর ভূমিক্ষয় আর পলি জমে দ্বীপ তৈরির প্রক্রিয়া একই সঙ্গে চলতে থাকে। দ্বীপের কলেবর কমতে থাকবে না বাড়তে থাকবে তা নির্ভর করে এর মধ্যে কোন প্রক্রিয়াটার প্রভাব স্থানীয়ভাবে বেশি।

এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ভারসাম্য মানুষের অনুপ্রবেশে, তাও বিপুল সংখ্যায়, বিশেষভাবে বিঘ্নিত হয়ে, ক্ষয়ের প্রক্রিয়াকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী করেছে। এর ওপর রয়েছে এক আন্তঃরাষ্ট্র বিশেষজ্ঞগোষ্ঠীর করাল ভবিষ্যৎবাণী যার নিহিতার্থ: সমুদ্রের জলস্তর আর কয়েক দশকেই এক মিটার বাড়বে।

তাই অধিকাংশ গবেষকদের মত যে সুন্দরবনের মনুষ্যবসতি এক নিশ্চিত বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। অতি দ্রুত, হয়তো বা এই শতকের মধ্যেই।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে এ জাতীয় ভবিষ্যহীন বিপর্যয় প্রবণ অঞ্চলে প্রতিটি ধ্বংসলীলার পর পুনর্গঠন যুক্তিযুক্ত হচ্ছে কিনা সেটা কতটা বিচার করা হয়। পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে দেয়া মানে ধ্বংসলীলার আগের বিপন্নতায় ফিরিয়ে দেয়া নয় তো?

অতএব যতই মর্মান্তিক হোক একথা এখন স্বীকার করে নিতেই হবে যে সব অঞ্চল অত্যুগ্র বিপর্যয় প্রবণ সে সব অঞ্চলে বারংবার অর্থব্যয় অনন্তকাল চলতে পারে না। তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেই সব অঞ্চল চিহ্নিত করা যেখানে পুনর্নির্মাণ অর্থহীন। সে সব অঞ্চলের জন্য প্রয়োজন অধিবাসীদের আশু বিপন্নতা যতদূর সম্ভব লাঘব করা, বিপর্যয়ের সঙ্গে তাদের লড়াই করার ক্ষমতা বাড়ানো আর অনাবশ্যক ঝুঁকি নেয়া থেকে নিরস্ত করা। দীর্ঘস্থায়ী সমাধান অবশ্যই সেখান থেকে সরে যাওয়া।

মনে রাখতে হবে এ কাজ যদি মানুষের অসাধ্য হয় ত প্রকৃতিই এক দিন করে দেবে।

উল্লেখপঞ্জী:

১. হেনরি পিডিংটন (Henry Piddington, 1797-1858) — এ লেটার টু দি মোস্ট নোব্‌ল জেমস এন্ড্রু, মারকুইস অব ডালহাউসি, গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া। (A letter to the Most Noble James Andrew, Marquis of Dalhousie, Governor General of India, 1853)।

২. জোয়াও ডি ব্যারোজ (Joao de Barros, 1496 - 1570) — ডিকাডাস্ ডা এশিয়া (Decadas da Asia, 1552)।

সূত্রপঞ্জি:

সৌমেন দত্ত : প্রেক্ষাপট সুন্দরবন, ২০১০, আজকাল প্রকাশন।

Sayantan Bera: Fancy Wall for Sunderbans, Down to Earth, May 31, 2012

Ananya Roy: Vulnerability of Sunderbans Ecosystem Journal of Coastal Environments

এবং অন্তর্জালে লভ্য সুন্দরবন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ।

উমা

মোসলেম মুন্সি: মনোরোগীদের আশ্রয়দাতা

সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী

শিয়ালদহ-লালগোলা শাখায় বেথুয়াডহরি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের এক মৃগদাব অভয়ারণ্য-র জন্য খ্যাত এই শহর। এই শহরের পাঁচ কিলোমিটার দূরে প্রান্তিক গ্রাম --- 'গলায় দড়ি'। এই গ্রামেই গড়ে উঠেছে নাকাশিপাড়া নির্মল হৃদয় সমিতি। মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিদের কল্যাণে নিয়োজিত এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রাণপুরুষ মোসলেম মুন্সি। আর তাঁর সহযোগী হলেন স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ। এই পরিবারের ছত্রচ্ছায়ায় নিরাপদ আশ্রয়ে দিনযাপন করে চলেছেন বেশ কিছু তথাকথিত ভবঘুরে বা মানসিক রোগী। যাঁরা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন আর তথাকথিত শিক্ষিত ও ভদ্রলোকদের ঘৃণা, অবহেলা, বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্যে অবাক নয়নে চেয়ে থাকতেন। মোসলেম মুন্সি রাস্তাঘাটে দেখতে পাওয়া এইসব নাম বা পরিচয় না-জানা মানুষদের নিজের ঘরে এনে সুস্থ করার ব্রত নিয়ে লড়াই করে চলেছেন দীর্ঘ ২০ বছর।

১৯৯২ সালে স্থানীয় সিপিএম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই সদস্যের দুর্নীতি হাতেনাতে ধরে দুই সদস্যকেই পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন মোসলেম মুন্সি। প্রতিশোধ হিসাবে নাকাশিপাড়া থানাতেই 'বিনা কারণে' ডেকে নিয়ে গিয়ে ৫০০ বার কান ধরে ওঠবস করানো হয়। সেই ঘটনায় খানিকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন মোসলেম। এরপর তিনিও ইতস্তত ঘুরে বেড়াতেন। একদিন সেই সময় বেথুয়াডহরি বাজারে দেখেন যে, এক মানসিক রোগী এক চপওয়ালার কাছে তেলেভাজা খেতে চাইলেন। দোকানদার তাঁকে তেলেভাজা না দিয়ে হাতে গরম তেল ঢেলে দেয়। ঘটনাটি দেখে মোসলেম প্রতিবাদ করেন এবং সেই ব্যক্তিকে বাড়িতে নিয়ে এসে চিকিৎসা করে আস্তে আস্তে সুস্থ করে তোলেন। সেই শুরু। তারপর একে একে এই ধরনের অসংখ্য মানুষকে বাড়ি নিয়ে এসেছেন। যাঁদের অনেকেই স্মৃতি ফিরে পেয়ে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। আবার অনেকেই আর বাড়ি ফিরতে চান না। নাকাশিপাড়া নির্মল হৃদয় তাঁদের কাছে এক নিশ্চিন্ত শান্তির জায়গা। সেখানে তাঁরা ভালবাসা পান, সহানুভূতি পান। কেউ পিছনে লাগে না, ঢিল ছোঁড়ে না। বর্তমানে তাঁর আশ্রয়ে আছেন ২৭ জন মানসিক রোগী। এঁদের দেখাশোনা করার জন্য মোসলেম মুন্সির পরিবারের মানুষরাই আছেন। পুত্র সহিদুল চুল-দাড়ি কেটে দেন, পুত্রবধূ স্নান করিয়ে দেন, আর স্ত্রী রান্না করে খেতে দেন। মূলত নানা মানুষের অর্থিক সাহায্যে দৈনিক খরচ চললেও বাজারে তাঁর অনেক দেনা। মোসলেম মুন্সি নাকাশিপাড়ার বিল্ব গ্রামের এক সরকারি খামারে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী। মাইনের সিংহভাগ টাকা তাঁর খরচ হয় এই পাগলামোর জন্য। এমন কথাই বলেন স্থানীয় মানুষজন।

মোসলেম মুন্সি তাঁর মানবিক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ বেশ কিছু স্মারক সম্মান ইতিমধ্যেই পেয়েছেন। ২০০৮ সালে ২৪ ঘণ্টা চ্যানেলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছ থেকে 'সেরা বাঙালি অনন্য সম্মান', রাজভবনে ২০০৮ সালে তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর কাছ থেকে 'রুসি জিমি' সম্মান, ২০০৯ সালে জি বাংলা চ্যানেলের 'দাদাগিরি' অনুষ্ঠানে সৌরভ গাঙ্গুলি কর্তৃক সম্বর্ধনা। বিশেষ আর্থিক সাহায্য পান কৃষ্ণনগরের সাংসদ তাপস পালের সাংসদ তহবিল থেকে। দশ লক্ষ টাকা দুবার পেয়েছেন। এই টাকায় তৈরি হয়েছে এইসব মানসিক রোগীদের নিজস্ব আবাসস্থল— নাকাশিপাড়া নির্মল হৃদয় সমিতি। সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুসারে ২০০৭ সালেই নিবন্ধীভুক্ত।

বর্তমানে যাঁরা মোসলেম মুন্সির হেফাজতে আছেন তাঁদের কয়েকজন ভোলা, কাদের, টনি, সাকির, প্রণব, ওমপ্রকাশ, দীপক, যোগিন্দর, মিঠুন, বসির, যাদব, মোদরাম, সুব্রত, আলাই, অনন্ত প্রমুখ। কেউ আছেন ছ মাস, কেউ এক বছর, কেউ দু বছর বা তারও বেশি। কারো বাড়ি বিহার, কারো উত্তরপ্রদেশ, কারো বা বাংলাদেশে।

এঁদের অনেকেরই নিজের মায়ের দেওয়া নাম জানেন না। জানেন না কোথায় তাঁর বাড়ি বা বাড়িতে কে কে আছেন। মোসলেমই অনেকের নতুন করে নামকরণ করেছেন। এই নির্মল হৃদয়ে থাকতে থাকতে ইতিমধ্যে এই ২০ বছরে ৬০০ জনের অধিক মানুষ নিজের বাড়ি ফিরে গেছেন। আর যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেই নির্মল হৃদয়ের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে ফিরতে চান না। এই পরিবেশেই এক শিশুপুত্র এক বছর ধরে নানা মানুষের কোলে-পিঠে বড় হচ্ছে। এর একমাত্র পরিচয়, এক মানসিক রোগীর পুত্রসন্তান। এই সন্তানের পিতা কে, তার নিজের মাও জানেন না।

এক বছর আগে এক সন্তানসম্ভবা মানসিক রোগী বেথুয়াডহরির রাস্তায় প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। স্থানীয় লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। মহিলার এক পুত্রসন্তান জন্মায়। প্রসাসনের পক্ষ থেকে মোসলেম মুন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে মানসিক রোগগ্রস্ত মহিলাকে তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে যেতে বলে। মোসলেম হাসপাতালে এসে জানতে পারেন যে, মহিলাটি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তিনি আরো জানতে পারেন, সেই নবজাতককে নেবার জন্য অনেক মানুষ এসে জড়ো হয়েছেন। কিন্তু তাঁরা সন্তানের মাকে নিতে চান না। মোসলেম বলেন, তিনি মাকে নিয়ে যাবেন, তবে সন্তান সহ। তিনি প্রশাসনের উচ্চ মহলে জানান, মা ও তাঁর সন্তানকে একসঙ্গে পালন করবেন। মোসলেম ভাইয়ের দাবি প্রতিষ্ঠা করে দুজনকেই নিজের বাড়ি নিয়ে আসেন। সন্তানটি ভালভাবেই বেড়ে উঠছে। কিন্তু সে জানে না যে তার মা তাকে চেনে না। তার মা এক পাগলিনী।

মানবিক কাজে নিয়োজিত মোসলেম মুন্সিকে গত ৬ জুলাই শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতাল সুদক্ষিণা স্মৃতি পুরস্কার সম্মানে ভূষিত করে এককালীন পঁচিশ হাজার টাকা তুলে দেয়।

যোগাযোগ: মোসলেম মুন্সি, ফোন: ৯৪৭৪৪ ৮১৬৭৩/ ৮৯৭২৬ ২২৫০৯।

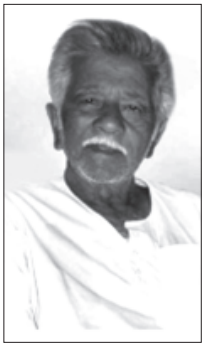

এক ‘বিশুদ্ধ’ মানুষ চলে গেলেন

বিশুদ্ধদা চলে গেলেন গত ৩১ মে, ২০১৪। মানুষটির পরিচয় নিহিত ছিল তাঁর নামের মধ্যেই, গোলগাল চেহারার বেঁটোখাটো মানুষটির সঙ্গে যখন যেখানে দেখা হয়েছে, একগাল হেসে হাত জোড় করে ‘ভাল আছেন দিদি’ বলে এগিয়ে এসেছেন। আজকের দিনে এমন মানুষ সত্যিই বিরল।

এহেন বিজ্ঞানমনস্ক সমাজমুখী বিশুদ্ধানন্দ পুরকায়েত জন্মেছিলেন ১৯৪৩ সালের ১লা জানুয়ারি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুলতানপুর গ্রাম ছিল বিশুদ্ধদার বাল্যের লীলাভূমি। শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নময় দিনগুলি কাটিয়ে যৌবনে পার রাখার পরেই বাইরের জগতে হাতছানি তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল। সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ অতিক্রম করে তিনি তাঁর ছাত্রজীবন শেষ করেন। জীবিকার প্রয়োজনে প্রথম জীবনে শিক্ষকতা করলেও পরবর্তীতে তিনি ডাক ও তার বিভাগের কর্মী হিসেবে চাকরি জীবন শেষ করেন।

কিন্তু ওটাই বিশুদ্ধদার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। তিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার ও নাট্যশিল্পী। নিজের এলাকায় বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি করতেন। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ছিল আজীবন। পরিবেশ আন্দোলনের একজন নীরব কর্মী ছিলে বিশুদ্ধদা। কলকাতায় ‘বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী’ পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং ‘উৎস মানুষ’ পত্রিকার সঙ্গেও প্রথমদিকে তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ৮০-র দশকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনেও তিনি সামিল ছিলেন। তাঁর নিজের বাড়ির এলাকা মন্দিরবাজারে প্রস্তাবিত সার কারখানাটি হতে পারে নি মূলত তাঁরই উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে। অকৃতদার এই মানুষটি সারা জীবন মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন। বহু মানুষকে তিনি নিয়মিত সাহায্য করে গেছেন সারাজীবন। কিন্তু তাই নিয়ে তাঁর কোনো আত্মপ্রচার ছিল না। বিভিন্ন সভাসমিতি ও অনুষ্ঠানে হাজির থাকতেন নির্দিষ্ট সময়ে। কিন্তু সময় দেখার জন্য তাঁর হাতে কখনও হাতঘড়ি থাকত না।

অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত আত্মপ্রচারবিমুখ বিশুদ্ধদা তাঁর কর্মময় জীবনের ইতি টানলেন গত ৩১ মে। কিন্তু রয়ে গেলেন আমাদের স্মৃতিতে ও মননে

পূরবী ঘোষ

পুস্তক পর্যালোচনা

এমন বই লেখার দরকার ছিল

ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ

কলকাতা পুকুর কথা ২০১৩ ● মোহিত রায় ●
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ● ২৫০ টাকা

মোহিত রায় পুকুর নিয়ে অনেকদিন ধরে নাড়া-ঘাঁটা করছেন। তারই বশে এই বইটা আমরা পড়তে পেলাম। কিছু কিছু স্বতন্ত্র অংশ নিবন্ধ হিসেবে এমনকি বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। সেই কারণে জায়গায় জায়গায় একই কথা ফিরে এসেছে। ফিরে এলেও এই বইটার গুরুত্ব পাঠকের কাছে থেকেই গেছে। আরও বড় কথা, পুকুর সম্বন্ধে লেখার দরকার ছিল এবং লেখক নিশ্চয়ই এ বিষয়ে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। বইটার বড় গুণ হল লেখার সময় বহুমাত্রিকতার ধরন সুস্পষ্ট।

'পুকুর নিয়ে শেখবার মূল পাঠশালা হল বিভিন্ন পুকুর পরিচালন সংগঠনগুলি, যারা কোনো সরকারি আনুকূল্য ছাড়াই নিজেদের চেষ্টায় এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে।' লেখক ভূমিকায় একথা বলেছেন। এই কথা কটি পাঠককে সুর বাঁধতে সাহায্য করে। বইটির ভাল দিক হল, কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে পুকুর বাঁচিয়ে রাখার যে ভাল কাজগুলি হচ্ছে তার হদিশ পাওয়া যায়। লেখক এই ছড়ানো-ছেটানো প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে যোগাযোগের কথা বলেছেন। ঠিকই বলেছেন। পুকুর টিকিয়ে রাখতে পুকুরের মালিকদের আর্থিক উৎসাহ দেবার চিন্তাটিও বাস্তব এবং ভাল। একই সঙ্গে লেখক ঐতিহ্যবাহী পুকুরের আলোচনা করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর উদ্বেগে সাড়া দেওয়া যেতে পারে। তেমনি আবার ছোট পুকুরের কথাও বলেছেন। তবে সেগুলি পাইকারি দরে বুজিয়ে দেবার কথা ঠিক কিনা তা নিয়ে আরও ভাবতে হবে।

পুকুরের বই লিখতে গিয়ে জলাভূমির সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা না করলেও পারতেন। যাঁরা আজীবন জলাভূমি নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরাও নিশ্চিন্তে কোনো সংজ্ঞায় আসতে পারেন নি। প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞাগুলি বাধ্যবাধকতা থেকে জন্ম নেয়, উপলব্ধি থেকে নাও হতে পারে। একইভাবে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি লেখক ভালভাবে জানার চেষ্টা না করেই লিখেছেন। এগুলি সহজেই এড়ানো যেত। পুকুরের বইয়ে জলাভূমি নিয়ে না লিখলে কোনোরকম অপূর্ণতা দোষে দুষ্ট হত না।

পুকুরের বই লিখতে গিয়ে জলাভূমির সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা না করলেও পারতেন। যাঁরা আজীবন জলাভূমি নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরাও নিশ্চিন্তে কোনো সংজ্ঞায় আসতে পারেন নি। প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞাগুলি বাধ্যবাধকতা থেকে জন্ম নেয়, উপলব্ধি থেকে নাও হতে পারে। একইভাবে পূর্ব কলকাতার জলাভূমি লেখক ভালভাবে জানার চেষ্টা না করেই লিখেছেন। এগুলি সহজেই এড়ানো যেত। পুকুরের বইয়ে জলাভূমি নিয়ে না লিখলে কোনোরকম অপূর্ণতা দোষে দুষ্ট হত না।

'ইকলজি'-কে উনি বাংলায় প্রতিবেশ বলেছেন। ইকলজিকে ইকলজি বললে কী ক্ষতি হত? অন্তত অনুপযুক্ত অনুবাদের থেকে তো ভাল! 'ফলিডল'-এর বাংলা হয় না। তাতে গ্রামাঞ্চলে ফলিডলের ব্যবহার কমে নি। পুলিশের বাংলা হয় না। তাতে পুলিশ কোথাও ম্রিয়মাণ হয় নি। আপাতত আমরা ইকলজিকে বরং ইকলজিই বলি। চোখ-কান খোলা রাখব, নিছক অনুবাদের তাগিদে কোনো কিছু মেনে নেবার বাধ্যবাধকতা নেই। ফলিডল চলবে, ইকলজিও চলবে। এ ছাড়াও বাংলা শব্দের ব্যবহারে কিছু আপত্তি আছে। যেমন, লেখক জনঘনত্ব লিখেছেন। একই জায়গায় 'জনঘন' কথাটিও লিখেছেন। জনঘন কথাটি সুপ্রযুক্ত নয়। কানে আটকাচ্ছে।

মানচিত্রভিত্তিক পুকুরের হিসেব এক জায়গায় নিয়ে আসার কাজটি দরকার ছিল। অবাক লাগে সবরকম সুবিধে থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের কাছে ২০১২ বা ২০১৩ সালের ওয়ার্ডভিত্তিক পুকুরের হিসেব নেই! শিক্ষক আছেন, ছাত্র আছে, প্রোজেক্ট আছে, পিএইচ ডি আছে অথচ পুকুর বুজে যাওয়ার বাসি হিসেব নিয়েই আলোচনা সারতে হবে! দোষ লেখকের নয়। বইটা পড়লে ঘাটতিটা ধরা পড়ে। তবে ঘাটতি ধরেও বা কি লাভ!

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শুরুতে লেখক আল গোরের কথা ঘটা করে বলেছেন। আল গোরের ২০টি বিশাল ঘর। গড় আমেরিকানের থেকে বিদ্যুৎ খরচ করেন ২০ গুণ বেশি। এতে মোহিত বিস্মিত। অথচ তথ্যে ভুল ধরা পড়েও ভারতীয় বিশেষজ্ঞ আইপিসিসি-র চেয়ারম্যান একই পুরস্কার পেয়েও দুনিয়া মাত করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার বেলা? আমাদের দেশে গড় ভারতীয়র ২০ গুণ বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন এমন অনেক পরিবেশবিদ হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন। কেউই তো রা কাড়েন না। দেশীয় কম্প্রাডর এবং তস্য চামচা-বেলচার দল কি আজও নজরের আড়ালেই থেকে যাবেন?

মোহিত লিখেছেন বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ বিপ্লবী। এটা মনে হয় ঠিক নয়। বিবেকানন্দের ভাই ভূপেন্দ্রনাথ বিপ্লবী হতে পারেন। দূরদ্রষ্টা ছিলেন। নিঃসন্দেহে বাংলার কৃষিব্যবস্থার দ্বন্দ্বমূলক (ডায়ালেক্টিক্যাল) আলোচনা করেছিলেন খুব সম্ভবত সর্ব প্রথম। এতদিন আগের কথা ভুল হতেই পারে। তবে অবাক লাগল লেখক অনুপম মিশ্রের কথা বলেন নি। অন্তত নির্ঘণ্টে নেই। এ আলোচনা পরে করব।

লেখক কার্ল মার্ক্সের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আশা ছিল, পুকুর বোজানোর পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজির ভূমিকার আলোচনা উনি গভীরে গিয়ে করবেন। পুকুর বোজানোর ব্যাপারটা নগরায়নের নয়, উন্নয়নের নয়, এটা যে পুঁজি সৃষ্টির সর্বাধুনিক প্রথা পদ্ধতির অংশ, সেই আলোচনাই নেই। বাড়ি তৈরির ব্যাঙ্কঋণ কেন আয়কর ছাড় পায়, তার সঙ্গে পুকুর বোজানোর সম্পর্কের আলোচনা, অন্তত প্রাথমিকভাবে এই বইতে থাকতে পারত। পুঁজি সৃষ্টির আধুনিকতম রূপের সঙ্গে রিয়েল এস্টেট কীভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং সেই ক্ষেত্রে পুকুরের ভূমিকা কী— এই প্রশ্নের উত্তর না জেনে পুকুর, ইতিহাস, পরিবেশ আর সমাজের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে।

লেখক রায় ২০১৩-তে বই ছাপালেন। ১৯৯৩ সালে পুকুরের উপর আরও একটি বই লেখা হয়েছিল। লেখক অনুপম মিশ্র। দশ লক্ষ বই ছাপা হয়ে গেছে তারপর। বাংলা নিয়ে প্রায় দশটি ভাষায় অনুবাদও হয়েছে। তার মধ্যে ইংরেজি আর ফরাসিও আছে। বইটার নাম 'আজ ভি খড়ে হ্যায় তলাব।' প্রকাশক গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠান। কেমন করে পুকুরের পরিবেশ, ইতিহাস আর সমাজ নিয়ে লিখতে হয়, তা এই বইটা পড়ে নিলে অনেকদূর জ্ঞান হয়। পড়ে নিলে হয়ত এই বইটি লিখতে মোহিতের আরও কিছুদিন সময় লাগত। বেশি সময় লাগত নতুন করে ভাবতে। তবু সেটা মনে রাখার মতো কাজ হতে পারত। আরও অনেক গ্রহণযোগ্য হত মননশীল পাঠকের কাছে। অন্তত যাঁরা অনুপমজির বইটা পড়েছেন, তাঁদের কাছে।

বাণিজ্যিক নয় মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বইচিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্যকেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিৎ ভট্টাচার্য (উযুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর : ৯৮৪০৯ ২২১৯৪ বা ৯৩৩১০ ১২৬৩৭।

মাইক ব্যবহারের গ্রামীণ চিত্র

সাধন বিশ্বাস

ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই সমস্ত ভাতের পরিস্থিতি জানা যায়। অর্থাৎ চাল হতে ভাতের পরিণতি কেমন। তেমনি আমাদের বাংলার একটি গ্রামের বর্তমানকালের মাইক ব্যবহারের কথা বর্ণনা করলেই ধরে নেওয়া যায় সমগ্র বাংলার মাইক ব্যবহারের গ্রামীণ চিত্র জানা যাবে।

আমি গ্রামে বাস করি। নিজের গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাইক ব্যবহারের কথা জানি। তাই আমার গ্রামের চিত্রটাই বলি।

দুর্গোৎসব দিয়েই শুরু করি। গত ২০১৩-য় পাঁচটি পুজো হয়েছিল। এক-একটি মণ্ডপে গড়ে ৬টি করে চোঙ এবং ৬টি করে বক্স বেজেছে। তাহলে মোট শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্রের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৬০টি। সে হতেই পারে; যারা অনুষ্ঠান করছে তারা ৬০ কেন, ১৬০টা মাইক বাজাতেই পারে। প্রশ্ন মাইকের সংখ্যায় নয়; প্রশ্ন হচ্ছে শব্দদূষণ নিয়ে। দূষণটি কীভাবে ঘটছে শুনুন। এই ৬০টি চোঙা এবং বক্স একযোগে প্রায় ২৪ঘণ্টা সারা গ্রামে শব্দতাণ্ডব চালায়। আইনে বলে ৯০ ডেসিবেলে শব্দসীমা বেঁধে রাখতে হবে। কিন্তু ৯০-এর হাজার গুণিতকে শব্দ-প্রলয় চলে।

আমরা জানতাম, বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ। এখন বারো মাসে আক্ষরিক অর্থে ৪৮ পার্বণ চলে। আর প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানেই ৯০-এর কত গুণিতকে মাইক বাজে কে জানে! সামান্য ছুতোনাতায় মাইকের তাণ্ডব না হলে চলে না। তা যার যত অসুবিধাই থাকুক না কেন। ছাত্রছাত্রী, অসুস্থ ব্যক্তি, শিশু-বৃদ্ধ, পরীক্ষা— যাই হোক উদ্যোক্তারা নির্বিকার। প্রতিবাদ করলে শুনতে হবে নোংরা ভাষা, মানসিক নির্যাতন, প্রাণনাশের হুমকি।

দুর্গাপুজোর পর লক্ষীপুজো। আগে লক্ষীপুজো ছিল শুধুই পারিবারিক; মাইক চলত না। এখন পারিবারিক পুজোর সঙ্গে যোগ হয়েছে বারোয়ারি। ধুমধাম করে চলে পুজো এবং তার অবশ্যম্ভাবী দোসর মাইক। তারস্বরে ২৪ ঘণ্টা।

তারপর কালীপুজো। এই মাকালী যেহেতু শক্তির দেবী, তাই এই পুজোয় অন্যান্য তাণ্ডবের সঙ্গে মাইক ও শব্দবাজির শক্তিটা বেশ জোরালো হয়। মাকালীর সন্তানেরা অর্থাৎ যুবক ভাইরা বেশ ক্ষিপ্ত এবং ক্ষিপ্র থাকেন। খেপে যান যখন-তখন। আপনার অসুবিধের কথা বিনয়ের সঙ্গে জানালেও কিংবা সামান্য ট্যাঁ-ফোঁ করলেই টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবেন। তাঁরা সবসময় 'পাগলাপানির' (মদ/চোলাই) লোভে থাকেন কিনা!

এর পর একে একে আছে কার্তিকপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, রাস-উৎসব, শনিপুজো, মনসাপুজো, বিপদতারিণী সহ নানান পুজো। আছে নাম সংকীর্তনের চার-পাঁচদিন ব্যাপী যজ্ঞ। তাছাড়াও আছে মানতের কালীপুজো, রক্ষাকালী পুজো শ্মশানকালী পুজো সরস্বতীপুজো। আছে বিভিন্ন সামাজিক, পারিবারিক অনুষ্ঠান— বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ। মাইক বাজে মুসলিমভাইদের অনুষ্ঠানে— মিলাদ (মৃতব্যক্তির স্মরণসভা), 'সভা' (ধর্মীয় জলসা), আছে আজান (নামাজের উদ্দেশে আহ্বান)। এই সমস্ত ছোট-বড় অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে মাইকের শব্দতাণ্ডব অবশ্যম্ভাবী। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সীমাহীন। আর আমরা হয়ত সবাই জেনে গিয়েছি যে, এক-দু দিনের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের দিন বাড়াতে বাড়াতে ১০-১২ দিন পর্যন্ত চলে। আবার অনুষ্ঠানের দু-তিন দিন আগে থেকেই মাইক চলা শুরু হয়ে যায়।

এখনও পর্যন্ত মাইক বাজে না 'পাকা-কথা'র দিন, সাধভক্ষণে আর ষষ্ঠী পুজো-ইতুপুজোয়। তবে আমার ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে এসব ব্যাপারেও তা শুরু হয়ে যাবে।

শব্দতাণ্ডবটা কেমন ভয়াবহ যাতনাময়তায় চলে, তার একটা ছোট উদাহরণ দিই। আমার বাড়ির অনতিদূরে চারপাশে চারটি সরস্বতী পুজো হয়। মহাধুমধাম সহকারে। প্রবল বিক্রমে মাইক বাজে চোঙা আর বক্স মিলে ৪০টার মতো। সে যে কী শব্দনাদ তা প্রত্যক্ষকারী ছাড়া কেউ বুঝবে না। একযোগে যখন মাইকগুলো বাজে তখন মনে হয় প্রলয়ঙ্করী ঝড় আর ভূমিকম্প হচ্ছে। মাটি কাঁপে থরথর করে। কান বিদীর্ণ করে সে শব্দ মাথাকে বিভ্রান্ত করে দেয়। এই চার মণ্ডপের উদ্যোক্তাদের মধ্যে চলে শব্দতাণ্ডবের প্রতিযোগিতা।

বছর দুই আগে আমাদের একটা গাভী ছিল। সরস্বতী পুজোর মাইকের শব্দাতঙ্কে কটা দিন সে নাগাড়ে আর্ত চিৎকার করেছে।

স্বাভাবিক খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল। ছটফট করছিল। দড়ি ছিঁড়ে পালাতে চাইছিল বিষময় দূষণ এলাকা থেকে।

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবার কল্যাণে মাইকের তাণ্ডব-হুংকার প্রবল আকার ধারণ করেছে। ব্যাটারিতে মাইক বাজালে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, বিদ্যুতে তার থেকে অনেকগুণে মাইক বাজে। তাছাড়া এখন যুক্ত হয়েছে 'ডি জে' নামক মাইক-সেট। যা প্রচণ্ড জোরে গুমগুম করে বাজে।

একটা না একটা কোনো অনুষ্ঠান নিত্যদিন হয়েই চলেছে। এবং অবশ্যম্ভাবী হয়েছে মাইক। খুব কম দিনই আছে, যেদিন মাইক বাজে না। এই লেখা যখন প্রস্তুত করছি, তখনও কাছাকাছি থেকে বিকট শব্দের মাইকের আওয়াজ আসছে।

যত রকম দূষণ আছে, তার মধ্যে মারাত্মক ক্ষতিকর দূষণ হচ্ছে শব্দদূষণ। এই দূষণে মানুষসহ বহু প্রাণীকুলের বহুবিধ ক্ষতি সাধিত হয়। মানুষের শারীরিক-মানসিক অনেক বিপর্যয়, ক্ষতি হয়। আসতে পারে অকাল বধিরতা। শিশুদের স্বাভাবিক মস্তিষ্ক বিকাশে বাধা আসতে পারে। বড়দের উচ্চ রক্তচাপ এবং উচ্চরক্তচাপজনিত সমস্যা, শ্রবণ যন্ত্রের ক্ষতি হওয়া, মাথা যন্ত্রণা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, হজমের গোলমাল, ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদি। মানসিক সমস্যার মধ্যে অনিদ্রা, খিটখিটে মেজাজ, কাজে অনাগ্রহতা, কথা-বার্তা বলতে অনীহা, ক্রোধ। মানুষের সঙ্গে মিশতে অনীহা (শব্দ তাণ্ডবকালীন নির্জনে বা অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপচাপ থাকতে ইচ্ছে হওয়া)। 'খারাপ' শব্দ হলেই চমকে ওঠা, স্মৃতিভ্রংশ, যৌন ইচ্ছা চলে যাওয়া ইত্যাদি। অনেক সময় এসব স্থায়ী সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক সমস্যার মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীসহ অনেকের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠনে প্রবল ব্যাঘাত ঘটে। অফিস-আদালতে সুষ্ঠুভাবে কাজ-কর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। পরিবেশ-প্রকৃতির ক্ষতির মধ্যে, প্রবল শব্দ বিক্রমে বিভ্রান্ত-আতঙ্কিত হয়ে পরিযায়ীদের বিমুখতা, 'রেসিডেন্সিয়াল' পাখিরা বিপন্ন বোধ করে; আতঙ্কে এলাকা ছেড়ে পালাতে চায়। তাদের প্রজননে ব্যাঘাত ঘটে। মৌমাছিরাও স্বাভাবিক 'ছন্দ' হারায়। শব্দের অত্যাচারে এক জায়গায় তারা স্থায়ী হতে পারে না।

এই শব্দ কেন্দ্রিক অপরাধগুলো সংঘটিত হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যুবকদের দ্বারা। যাদের মধ্যে অনেক 'শিক্ষিত' যুবক ভাইরাও আছে। এই যুবকরাই নাকি দেশকে সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সার্বিক কল্যাণসাধন করবে! ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে আগামী ভবিষ্যতের জন্য! কিন্তু এই 'কান্ডারীদের' মারমুখী আচরণ দেখলে লজ্জায় আপনার মাথা অবনত হবে, আতঙ্কে বুকের গভীরে কাঁপন জাগবে, ঘৃণায় বমনেচ্ছা হবে। এদের জন্যেই বহু মানুষ শব্দ শহিদ হয়েছেন। বহু মানুষ প্রতিনিয়ত নির্যাতিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত হচ্ছেন এবং হয়েছেন; তার কয়েকটা মাত্র আমরা সংবাদমাধ্যমে জেনেছি। আর বিরাট সংখ্যক ঘটনা নীরবে-নিভৃতে কাঁদে।

স্থানীয় প্রশাসন জেনে-শুনে এবং তাদের জানিয়েও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করলে আপনাকে নিশ্চিত শুনতে হবে, ''আরে বাবা অনুষ্ঠানে মাইক বাজবে না! আপনি কেমন অসামাজিক জীব মশায়?''

এক সময় সমাজবিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন ক্রমান্বয়ে মানুষের মধ্যে জাগবে বিজ্ঞান-চেতনা বোধ, বিজ্ঞান মনস্কতা। মানুষ মুক্ত হবে সংস্কারাচ্ছন্নতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা এবং ধর্মীয় উন্মাদনা হতে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আরও শক্তিশালী হয়েছে ধর্মীয় আগ্রাসন এবং ক্রমশ তা বর্ধনশীল। আর এই ধর্মীয় তাণ্ডবের হাত ধরেই ঘটছে শব্দদূষণের তাণ্ডব। যে রাজ্যে তথা দেশে প্রাশাসনই শব্দ-দূষণে উৎসাহ দেয়, সেখানে প্রশাসন শব্দাসুরের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে এটা ভাবা মানে মূর্খের স্বর্গে বাস করার সামিল।

উৎস মানুষ

গ্রাহক হবার নিয়ম

বছরে ৪টি বেরোয়, ৩ মাস অন্তর। চাঁদা বছরে ১০০ টাকা। বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। UBI-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে UBI কলেজ স্ট্রীট শাখায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নীচে দেওয়া হল—

United Bank of India,
College Street Branch, Kolkata- 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO.
0083010748838.IFSC NO.UTBI0COLI08

ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা (পিনকোড ও ফোন নং সহ) এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। বইমেলার স্টলে গ্রাহক করা হয়। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা হয়। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

চিঠিপত্র

সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়,

'উৎস মানুষ' পত্রিকার এপ্রিল-জুন ২০১৪ সংখ্যা প্রসঙ্গে এই পত্রের অবতারণা। বিজ্ঞান, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সাম্প্রতিক নির্বাচনের কথা। গরিব মানুষদের কথা বলা হয়েছে। যাঁদের নিয়েই নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে চায় রাজনৈতিক দলগুলি। বিষয়টা সকলেরই অবগত। নতুন কিছু নয়। তবুও আমজনতা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এইবারের নির্বাচনে দুটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়েছে। একটি নোটা এবং অপরটি তৃতীয় লিঙ্গধারী মানুষের ভোটাধিকার। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পাদকীয়তে নির্বাচনের আলোচনায় স্থান পায় নি। এবং যথারীতি এই বিষয়ে এক হিন্দী (?) গানের কলির কথা উল্লিখিত হয়েছে। সম্পাদকীয়তে এসেছে কিছু মানুষের নাম ও কিছু প্রতিষ্ঠানের কথা। যাঁদের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ উৎস মানুষের সহজাত। দেশের প্রতিটি মানুষকে ঠিক ঠিক ভাবে বেঁচে থাকতে রাষ্ট্রেরই একমাত্র দায়িত্ব। রাষ্ট্র যেখানে এই দায়িত্ব পালন করে না তখন প্রয়োজন হয় বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তির। এদেরই কি আদৌ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে নানা মত থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশ বলে নয় সারা পৃথিবীতে প্রায় সব দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন সমাজসেবার কাজে যুক্ত। এদের পছন্দ করা না করাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাব আমাদের দেশে বেশি। কারণ সামাজিক অবস্থা। আমরা মানুষকে হয়তো সেভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারিনি। তাই এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাগুলির রমরমা। এর দায় কার, এই নিয়ে তর্ক আছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে যে, বিবেকানন্দ, টেরিজা, গান্ধীদের তো জন্মই হত না। তাহলে বাঙালি জাতটার কী হত। মারাত্মক কথা। প্রথম কথা টেরিজা বাংলায় প্রতিষ্ঠা পেলেও বাঙালি নন। গান্ধী তো ননই। শুধু বিবেকানন্দ বাঙালি। তাহলে তিনজনকে একই পঙতিতে ফেলা কেন। আর বাঙালি জাত কেন? 'জাত' শব্দটাতে আমার আপত্তি। ভারতবর্ষের অনেক ভাষাভাষীর মানুষের বাস। সেখানে বাঙালির অবস্থাই কি বিপন্ন। যদিও পরে উল্লিখিত হয়েছে, যে বড় গুরুজনদের কথা ছেড়ে এবার নিজেদের কথা, যদি উল্লিখিত মানুষদের 'বড় ও গুরুজন' বলে স্বীকার করে নিই তাহলে ন্যূনতম সম্মান জানানোটাই শালীনতা।

আলোচ্য সংখ্যায় বইমেলা নিয়ে আলাদা প্রতিবেদন আছে (৩১ পাতা)। এই প্রসঙ্গে জানাই যে এই প্রতিবেদনের সঙ্গে একটি আলোকচিত্র আছে, যেখানে উল্লেখ আছে যে উৎস মানুষের স্টলের সামনে কয়েকজন। খুব ভালো কথা। কিন্তু এই আলোকচিত্র কখনই প্রমাণ করে না যে উৎস মানুষের স্টলের সামনের ছবি। ছবিতে কয়েকজন মানুষকে প্রধান্য দেওয়া হয়েছে। স্টলে যে 'উৎস মানুষ' লেখা সেই বিষয়টা ছবিতে স্থান পাওয়া উচিত ছিল। ভবিষ্যতে বিষয়টা ভেবে দেখবেন। যেখানে ছবিই বলে দেবে যে স্টলটি কাদের। আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে না। যে কোন স্টলে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে নীচে লিখে দিলেই তো হয়। তাহলে ছবির আর গুরুত্ব কোথায়। এই প্রতিবেদনে কোথাও উল্লেখ নেই যে, বইমেলাটি কোন বছরের।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিনীত

সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী, চাতরা, শ্রীরামপুর।

সম্পাদকের সাফাই

সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী মহাশয় উৎস মানুষ পত্রিকার একজন অত্যন্ত মূল্যবান পাঠক। পত্রিকাটি খুঁটিয়ে পড়েন, সমালোচনা করেন, ভুলত্রুটি দেখিয়ে দেন। দীর্ঘ পত্র লেখেন। প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে রাখি, ওঁর অখণ্ড পত্রকে ছাপতে না পারার জন্য। কারণ, জায়গার অপ্রতুলতা। উনি যত প্রশ্ন তোলেন, তার সবগুলোর জবাব দেওয়া কিছুটা সেই কারণেই সম্ভব নয়। তবু গত এপ্রিল-জুন সংখ্যা নিয়ে ওঁর অভিযোগে জানাই, আমাদের সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের বিষয় নির্বাচন ছিল না, ছিল গরিব মানুষদের নিয়ে নির্বাচনী রাজনীতি। প্রতিবেদনে গান্ধী, টেরিজাকে বাঙালি বলে কোথাও দাবি করা হয়নি। ওঁদের নাম নেওয়া হয়েছে বাঙালিরা ওঁদের সমাজসেবক হিসাবে পুজো করে বলেই। আর টেরিজার কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাতেই।

আলোকচিত্রটি উৎস মানুষের স্টলের সামনের, এটা একটা প্রমাণ করার বিষয়, সেটা খেয়াল করিনি। যে ছবিটি ছাপা হয়েছে, তাতে উৎস মানুষ পত্রিকা লেখাটা দেখা যাচ্ছিল না বলেই ক্যাপসনে স্টলের সামনে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই ক্যাপসনের প্রয়োজনীয়তা। পত্রলেখকের প্রস্তাব মানতে গেলে, যাঁরা পুরীতে ঘুরতে যান, তাঁদের সমুদ্রের ছবি তোলার সময় পুরীর সমুদ্র লেখা বোর্ড এনে লাগাতে হবে। না হলে পুরী না দীঘা, তা নিয়ে সংশয় হতে পারে। প্রতিবেদনটি পড়ে কেউ পাঁচ-সাত বছর আগের বইমেলার প্রতিবেদন বলে ভুল করবেন, সেই সম্ভাবনার কথাও মাথায় ছিল না।

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 20.00
৩৪ বর্ষ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪ ২০ টাকা মাত্র

প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ	সংকলন	৪২.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক	রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু	হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
এটা কী ওটা কেন	সংকলন	৫০.০০
যে গল্পের শেষ নেই	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৫০.০০
আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান	সংকলন	৫০.০০
আরজ আলী মাতুব্বর	ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	নিরঞ্জন ধর	১০০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	সংকলন	৬০.০০
প্রমিথিউসের পথে	সংকলন	৩৫.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	সম্পাদিত	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	সংকলক: প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৪০.০০
মূল্যবোধ	সংকলন	৫০.০০

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুন্ডু, ২৯/৩, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বি বা দী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রিট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রিট), বইকল্প ১৮বি, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলকাতা-৩১, জ্ঞানের আলো (যাদবপুর কফি হাউসের উল্টোদিকে), থিমা, ৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬, ডঃ গৌতম মিস্ত্রি, ইনস্ট্যান্ট ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস, মন্ত্রীবাড়ি রোড, পোঃ চৌমাথা, আগরতলা- ৭৯৯ ০০১। ফোন: (০৩৮১)২৩০৮২৪৪/২৩১২৯৩৭।

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ